# নিষাদ

চিত্ত সিংহ

পরিবেশক : বিশ্বজ্ঞান
৯/৩ টেমার লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : চিত্ত সিংহ
সহযোগিতায় : কমল তপাদার

প্রথম মুদ্রণ : জুন, ১৯৬৩

প্রকাশক : অসীম রায়
সৃজনী
৯/৩ টেমার লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক : হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১ রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই
তৈফুর

সিল্কস্ক্রীন প্রচ্ছদ মুদ্রক : দিলীপ ভৌমিক

শ্রদ্ধেয় বিমল কর

ও

শ্রদ্ধেয়া গীতা বৌদিকে

নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুম।

............................................

পুষ্পিণ্যৌ চরতো জঙ্ঘে ভূষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ।

............................................

আস্তেভগ আসীনস্যোর্ধ্বস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ।
শেতে নিপদ্যমানস্য চরাতি চরতো ভগঃ।।
চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্।।
চরৈবেতি, চরৈবেতি।
—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ

চলতে চলতে যে শ্রান্ত তার আর শ্রীর অন্ত নেই, হে রোহিত, একথাই চিরদিন শুনেছি।

............................................

যে চলে, দেহের দিক থেকেও তার অপূর্ব শোভা ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, তার আত্মা দিনে দিনে বিকশিত হতে থাকে। এই তো মস্ত ফল।

............................................

যে বসে থাকে তার ভাগ্যও বসে থাকে, যে উঠে দাঁড়ায় তার ভাগ্যও উঠে দাঁড়ায়, যে শুয়ে পড়ে তার ভাগ্যও শুয়ে পড়ে, যে এগিয়ে চলে তার ভাগ্যও এগিয়ে চলে।

চলাই হল অমৃত লাভ, চলাই তার স্বাদুফল। চেয়ে দেখ ঐ সূর্যের আলোকসম্পদ, যে সৃষ্টির আদি হতে চলতে চলতে একদিনের জন্যও ঘুমিয়ে পড়েনি। অতএব এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।

# নিষাদ

রচনাকাল : ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১/মে, ১৯৬৩

'নিষাদ' একটি সাংকেতিক উপন্যাস।

...　　...　　...　　...

'অন্ধকার আলোকিত হউক' এই অনন্ত প্রার্থনাই এ গ্রন্থের উৎস। এবং আমি বিশ্বাসী —'স য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ। তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ! অমৃতো হিরণ্ময়ঃ।'— ঐ যে হৃদয়স্থ আকাশ, তন্মধ্যে মনোময়, অমৃত ও হিরণ্ময় (অর্থাৎ জ্যোতির্ময়) পুরুষ আছেন। 'অপ্পে* অপ্পা ঝাইযই* নিব্বানং পউ দেহু॥' —সেই আপনার মধ্যে আপনাকে পাওয়াই হল নির্বাণ লাভ।

..........................................

এ গ্রন্থ রচনায় যদি কোনো কৃতিত্ব থাকে, সে আমার নয়, আমার ঈশ্বরের; ত্রুটির, সমস্ত ত্রুটির জন্য দায়ী আমি, আমার বয়স, আমার অতি-পরিমিত ক্ষমতা।

..........................................

প্রয়োজনে কয়েকটি শব্দের পরিবর্তন করেছি। এবং বানান ভুল কিছুতেই এড়ান গেল না। বলাবাহুল্য আমার অশিক্ষাই তার মূলে।

**চিত্ত সিংহ**

১

## তমোজ্যোৎস্নায়

ক্রমে ওরা জনপদের অবিরাম কোলাহল আর অসহনীয় কলঙ্ককে ছাড়িয়ে এল। যাত্রালগ্নে যে সূর্যটা মাথার উপরের বিসারিত আকাশ, ছড়ান মাঠ-মাটি, দশদিক জুড়ে আলো হয়ে ছিল; ওদের পথ চলার মগ্নতায় সেই আলোয় আলোময় সূর্যটা কখন যে মেঘের আড়ালে চলে গিয়েছে, ক্রমে মেঘে মেঘে আকাশ ঢেকে গেছে, আলো নিবে গেছে, এবং এক বিরক্ত-মুখো আবহাওয়া চতুর্দিক গ্রাস করেছে, ওরা তার কিছুই খেয়াল করে নি। যখন খেয়াল হল তখন, প্রায় অন্ধকারে পথ ঝাপসা হয়ে এসেছে, হাওয়া স্থির, আশেপাশে যূথবদ্ধ এক অর্বাচীন বিষণ্ণতা। ফলে ওদের চলা দ্রুত হল, ওদের মগ্নতা ভাঙল। ঠিক তখনই, আকাশ, না আকাশ নয়, মেঘ, বিকট শব্দে ফেটে পড়ল। ওরা প্রথমে চমকাল। চমকের ঘোর কাটতেই পথচলতি একজনকে ডেকে সবিনয়ে জিজ্ঞেস করল, স্থানীয় স্টেশানটা কত দূরে, এবং পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?

সমস্ত কথাবার্তাই দ্রুত, অতি দ্রুত সম্পন্ন হল। লোকটা বলল, ঠিকমত যদি পা চালিয়ে যান, তাহলে সন্ধ্যের আগে আগেই পৌঁছতে পারবেন।

ওর কথা শেষ হতে না হতেই ওরা আবার জিজ্ঞেস করল, শেষ ট্রেনটা ক'টায় ছাড়বে বলতে পারেন ?

লোকটা চলতে চলতেই জানাল, সন্ধ্যের পরে।

লোকটা চলে গেল।

চলে যেতেই তার কথাগুলো ওদের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে সুরু করল। প্রথমে সেই লোকটার সমস্ত কথা, ক্রমে প্রতিটি শব্দ। ওরা শুরুর শব্দটা নিয়েই প্রথমে বিব্রত হল। ওদের মনে হল 'ঠিকমত' কথাটাই কেমন যেন জটিল এবং ঘোরাল। আসলে 'ঠিকমত' বলতে কি বোঝাতে চেয়েছে, কতটুকু বোঝাতে চেয়েছে, তা ওরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না। ওদের মনে হল, 'ঠিকমত' কথাটা আদৌ কোন কথা নয়। না, বরং ওদের মনে হল, এ-কথাটা সেই লোকটার একান্ত ভাবে আপন ধারণার, আপন হিসেবের কথা। এ-কথা দিয়ে অপরজনকে কিছুই বোঝান যায় না; অথবা বলা যায়, অন্যেরা এ-কথা থেকে কিছুই সঠিক বুঝতে পারে না। সুতরাং, ওরা আরো দ্রুত চলতে লাগল। এবং চলতে চলতেই ওদের মনে পড়ল 'সন্ধ্যা'র কথা। আসলে 'সন্ধ্যা' কোন নির্দিষ্ট সময় নয়, দিনের শেষ ও রাত্রি শুরুর সন্ধিক্ষণ। কিন্তু এমনি মেঘলা অন্ধকার আবহাওয়ায় দিনের শেষ বোঝা একেবারেই অসম্ভব। বরং যা অবস্থা তাতে ওদের মনে হল, ইতিমধ্যেই সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে, অথচ লোকটার কথামত সেই কাছের স্টেশানটা ওরা এখনো দেখছে না।

এদিকে অন্ধকার ক্রমে ঘন হচ্ছে, ঘন, আরো ঘন, গাঢ়। আর তক্ষুণিই বেয়াড়া আকাশটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল মাথার ওপর। বৃষ্টি এল।

কিছুক্ষণের বৃষ্টিতেই প্রথমে ধুলো মরল, ক্রমে ধুলো কাদা হল, পথ পিছল। ওরা আর আগের মতো পথ চলতে চলতে ভাবতে পারছিল না। না তা নয়, ভাবতে ভাবতে পথ চলা ওদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। ওদের পরিপূর্ণ মনোযোগ কাড়ল পথ, আর ওদের চলা। স্বাভাবিক

ভাবেই চলা ধীর হল, এবং ওদের আশঙ্কা হল, এভাবে চললে হয়ত ওরা শেষ ট্রেন ফেল করবে। যদি ফেল করে, তাহলে, পুরো রাত্তিরটাই ওদের স্টেশানে কাটাতে হবে, এবং নিঘুর্ম কাটাতে হবে।

কারণ এখানকার, অর্থাৎ জনপদের এবং জনপদের কাছাকাছির সমস্ত স্টেশানই নোঙরা, অপরিচ্ছন্ন। সেখানে অজস্র মশা, সংখ্যাহীন মাছি ও অগণন ছারপোকা। তাছাড়া আছে স্বল্পতম আলো ঘিরে সাত লক্ষ দেয়ালি পোকা। সবচেয়ে বড় কথা, এ স্টেশানে নিশ্চয়ই কোন বিশ্রামাগার নেই ; যদি থাকেও তাহলে সেখানে ভদ্রভাবে বিশ্রাম করা কিছুতেই সম্ভব নয়, যেহেতু মশা, মাছি···না, এখন আর এতটুকু ভাববার অবকাশ নেই, কারণ সর্বাগ্রে ওদের পেঁছিতে হবে সেই স্টেশানে, তারপর ওরা ওদের ভাবনাগুলো নিয়ে যথেচ্ছ নাড়াচাড়া করবে, যদি তার প্রয়োজন হয়, যদি প্রয়োজন আদৌ থাকে।

ওরা যথাসাধ্য দ্রুত হাঁটার চেষ্টা করছে। কিন্তু বৃষ্টির খেয়ালীপনা আর জলে কাদায় একাকার মেঠো পথে চলার অনভ্যস্থতা ক্রমে নিদারুণ বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল। এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে পারলে ভাল হত এমন একটি ইচ্ছা ওদের মনে উঁকি ঝুঁকি মারে নি তা নয়, কিন্তু সেই ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দেবার দুঃসাহস আর অবশিষ্ট ছিল না। তবু ওরা চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে নিতে ভোলে নি, কিন্তু কোথাও কোন একটা ছাউনি অথবা বাড়ি, অথবা পোড়ো ঘর ওদের নজরে আসে নি। একে বৃষ্টির অঝোর ঝরণ, তদুপরি দমকা হাওয়া মাঝে মাঝে। বৃষ্টির সেই শুরুতেই ওরা ভিজে জবজবে হয়ে গিয়েছিল। এখন ওরা শীতে রীতিমত কাঁপছে, তবু চলা থামিয়ে কোন গাছতলায় অথবা অন্য কোথাও আশ্রয় নেবার কথা পলকের জন্যেও ভাবতে পারল না।

ইতিমধ্যে অন্ধকার আরো ঘন, আরো গাঢ় হলে, যদিও অনর্গল বৃষ্টি আর অবিরাম ধারাশব্দে চারিদিক মুখর, তবু ওরা শুনল, ক্রমে কলকল জলের ধ্বনি, ঝিঁঝিঁর একহারা ডাক, একটানা ব্যাঙের গান আর হঠাৎ হঠাৎ লাফিয়ে পড়ার শব্দ। ফলে পরিবেশ ভীষণ থমথমে মনে হল,

আর মনে পড়ল, এমনি ভয়ংকর ভয় ধরান রাতেই মানুষকে নিশি পায়।

নিশি পাওয়ার কথা মনে পড়তেই, কিছু সংখ্যক ঘটনা যা নিশি সংক্রান্ত, পর পর ওদের মনে ছবি হয়ে গেল। তাতেই ওদের প্রসন্ন ইচ্ছেগুলো হঠাৎ সংকুচিত হল, এবং এই মানসিক সংকোচনের সুযোগে ওরা প্রথমে ভয়, পরে নিদারুণ উদ্বেগকাতর হল। ওদের মনে হল সত্যিই যদি নিশি পায়, তাহলে, সারা রাত্তিরেও ওরা কোন স্টেশানে পেঁছিতে পারবে না, শুধু ওরা চলবে একই পথে অনেকবার, অথবা একই ধরনের অনেক পথে বারম্বার। এবং পুরো একটি রাত্রি এভাবে নষ্ট হবে এটা ওরা সহজে মেনে নিতে পারল না।

অথচ এদিকে আরো আরো অন্ধকারে সব কিছু, সমস্ত কিছুই ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে। এখন আদৌ বোঝা যাচ্ছে না এ অঞ্চলে কোন জনমানুষের বসতি আছে কিনা! যদিও থাকে সে কোন দিকে, কোথায়, কতদূরে, তা ওদের জ্ঞানের অভিজ্ঞতার বাইরে।

বিকট শব্দে একটা বাজ পড়ল।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটো অজস্র সাপের মতো অনেকগুলো বিদ্যুৎরেখা মেঘময় আকাশটাকে চিরে চিরে অনেক দূরে মিলিয়ে গেল। এতে সুবিধে হল এই যে, বিদ্যুতের আলোয় ওরা দেখল এখানেই রাস্তাটা হঠাৎ দুমুখো হয়ে গেছে। ডাইনের রাস্তাটা কদ্দূর গেছে ওরা দেখার চেষ্টা করল না। দেখল, বাঁয়ের রাস্তাটা কিছু দূরেই শেষ হয়েছে। এবং যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একখানা টিনের ঘর, পাশে একটা আটচালা। আটচালার নীচের অংশটা রেলিঙ দিয়ে ঘেরা। ওদের বুঝতে কষ্ট হল না ওইটাই সেই স্টেশান, যেখানে পেঁছিতে ওরা অনেকক্ষণ থেকে চেষ্টা করছে। ওরা দ্রুত এগোতে লাগল।

এগোতে এগোতে ভাবল, হয়ত ঝড় জলে বাইরের বাতি নিবে গেছে, এবং স্টেশান মাস্টারের ঘরের আলোও ওরা দেখছে না, কারণ মাস্টার মশাই জলের ছাঁট আর ঝোড়ো হাওয়া থেকে কাগজপত্তর বাঁচানর জন্যে

হয়ত জানলা দরজা দুই-ই দিয়ে ট্রেন আসার সময় গুণছে। প্রসঙ্গত ওদের মনে হল, প্যাসেঞ্জারের অনুপস্থিতির কারণ এই দুর্যোগ। এবং দৃঢ় ধারণা হল, শেষ ট্রেন এখনো যায় নি, ওরা সময় মতই এসে পৌঁছেছে। ওরা নিজেদের এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের জন্য মনে মনে গর্ব এবং অশেষ পুলক অনুভব করল।

ক্ষণ বিলম্বে ওরা যখন সেই ঘরের খুব কাছে, যখন ওরা সেই চালার নীচে এসে দাঁড়াল, তখন—ওরা বুঝল, ওদের সমস্ত মনে হওয়াই মিথ্যে, ভয়ংকর রকমের মিথ্যে। আসলে এটা কোন স্টেশানই নয়।

এবং পলকে অন্ধকার ভয়ংকরী হয়ে উঠল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মুহুর্মুহু গর্জনে আকাশ লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। তীব্রধার বৃষ্টি আর অবিরাম ধারা-শব্দে হতবাক ওরা কিছুক্ষণ বজ্রাহতের মতো অনড় থেকে আচমকা সংবিৎ ফিরে পেতেই ওদের তীব্র তীক্ষ্ণ ইচ্ছে হল ছোটার, সবেগে ছোটার। কিন্তু ভয়, এবং তারও চাইতে অভাবিত এক বিপন্ন বিস্ময় ওদের ছোটার বেগ কেড়ে নিল। ওরা বদ্ধ মাতালের মতো টলতে টলতে এগিয়ে গেল আটচালার নীচে, যেখানে অনেক জঞ্জাল, যেখানে দাঁড়ান অসম্ভব, নিরর্থক। যেহেতু উপরের চালায় অক্ষত টিন আর একটিও অবশিষ্ট নেই, এবং ঘরের অবস্থাও ততোধিক শোচনীয়। এবং চতুর্দিকে অধঃপতিত জলের শব্দ, জল আর জল। অথচ কোথায় যাবে, কোথায়—এমনতর জটিল প্রশ্নে বিমর্ষ হতে হতে ওদের মনে হল, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই ওদের ভুল সংবাদ দিয়ে ঠকিয়েছে। ওরা নিশ্চিত বুঝল, আসলে এ অঞ্চলে কোন স্টেশানই নেই, যেখান থেকে সেই আশ্চর্য ট্রেনটা ছাড়ে, যেটা সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্যে সেই সত্যপীরের দরগায় পেঁছে দেয়। এবং এই রেলিঙ ঘেরা আটচালা ও ঘর, ওরা ভাবল, হয়ত কোন এক সময়ে, কোন দূর অতীতে জরুরী হল্টেজ হিসেবে ব্যবহৃত হত, এখন সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। তাছাড়া সামনের রেল লাইনও নিশ্চিহ্ন। যদিও দু-একটা ভাঙা ওয়াগান এখানে সেখানে পড়ে

আছে, আটচালার নীচে কিছু ভাঙাচোরা সরঞ্জাম। বলাবাহুল্য এ সবই ওদের অনুমানের সপক্ষে প্রমাণ।

হতাশার একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ওরা ভাবল, ভেবে খুশি হতে চেষ্টা করল যে, হয়ত অন্যদিকে কোথাও একটা স্টেশান আছে। সম্পূর্ণ ভুল পথে আসার জন্যে হয়ত ওদের এই দুর্ভোগ। স্বভাবতঃই ওরা তৎক্ষণাৎ উৎকর্ণ হল, যদি কোন দ্রুত চলা ট্রেনের শব্দ অথবা দিগন্ত বধির করা কোন বাঁশির আওয়াজ কানে আসে। কিন্তু মেঘের গুরু গুরু আর মুষলধার বর্ষণের শব্দ ছাড়া ওদের কানে আর কিছুই ধরা পড়ল না।

সহজেই ওরা বুঝল ক্রমে ওরা দুর্ভাগ্যের কবলিত এবং এই নিদারুণ রাত্রিতে ওদের সম্মুখে দুটিমাত্র উপায় বর্তমান—হয় ওরা স্থির থাকবে, নয়ত লক্ষ্যহীন ভাবে ক্রমাগত হাঁটবে, এবং অতি ক্লান্তিতেও ওরা বিশ্রামের ইচ্ছা কিছুতেই প্রকাশ করবে না।

যেহেতু পরিবেশ ও পরিপার্শ্বের ক্রিয়া অসহায়ের উপর প্রবল, যেহেতু দুর্বলকে দ্রুত পরিশ্রান্ত করে, দারুণ ভীরু, সেহেতু প্রথম উপায়টাকে প্রশ্রয় দেবার কথা ওরা আদৌ ভাবল না। যা হয় হবে, এমন এক অমানুষিক দুঃসাহসে ওরা চলায় উদ্যোগী হল। ঠিক সে সময়ে বিকট শব্দে একটি বাজ পড়ল। সেই বজ্রের আলোয় ওরা দেখল, দূরে, অনেকটুকু জায়গা জুড়ে অনেকগুলো ঘর দুর্গের মতো দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চিত ঠাঁই পাবে এই বিপুল বিশ্বাসে খরবেগ বর্ষণের মধ্যেও চতুর হরিণের মতো ওরা দ্রুত ছুটতে লাগল। লক্ষ্য যত নিকটতর হচ্ছে, ওদের বেগও তত বাড়ছে। কিন্তু আশ্চর্য, যখন ওরা গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি তখন অন্ধকার প্রবল, ঘরগুলোর আশীর্ষ ডুবে আছে সেই অন্ধকারে, ওরা, না, ওদের মনে হল, ওরা প্রায় শ্বাপদ হয়ে জনপদে ঢুকছে। যদি বিপরীত সম্বর্ধনা আসে, যদি ভাগ্য ওদের নিয়ে আবার মর্মান্তিক খেলায় মেতে ওঠে, তাই ওরা অতি সন্তর্পণে এগোতে

এগোতে যখন ঘরগুলোর একেবারে কাছাকাছি, মুখোমুখি, তখন— তখনই বিকট এবং বিলম্বিত শব্দে আর একটি বাজ পড়ল, বিদ্যুৎ চমকাল। অন্ধকার বিদীর্ণ করা সেই হঠাৎ উদ্ভাসিত আলোয় ওরা স্পষ্ট দেখল, ওদের সম্মুখে ভয়ংকর বিশাল দৈত্যের মতো উন্নতদেহ কতগুলো দেয়ালই শুধু খাড়া হয়ে আছে, কোন ঘর, অথবা মনুষ্য-বাসোপযোগী কোন আবাস নয়।

অনন্ত ভয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওরা থরথর করে কাঁপতে লাগল।।

## ২
## ঘনান্ধকারে

অর্থাৎ যা ঘটছে, যেহেতু এ সমস্তই ওদের ধ্যান-ধারণা ও কল্পনার অতীত, যেহেতু এ সমস্তই অভাবিত এবং অস্বাভাবিক, সেহেতু বিস্ময়ের চেয়ে প্রবল যে অনুভব, যার নাম ভয়, যে ভয়ের কবলিত হলে মর্মান্তিকভাবে আপন অস্তিত্বকে অনুভবে স্পর্শ করা যায়, পায়ের নীচের মাটিকে মনে হয় দ্রুত সঞ্চরমাণ কোন জলজ প্রাণীর পিচ্ছিল পিঠ, মনে হয় চোখের সম্মুখের অন্ধকার আরো আরো অন্ধকারে জান্তব, দন্তুর, ওরা ক্রমে সেই দিগন্তগ্রাসী সর্বনাশা ভয়ের করধৃত আমলকী হয়ে গেল।

সংবিৎ যখন ফিরল, তখন ঘন গাঢ় তমসায় চতুর্দিক মূর্ছিত। আকাশে নক্ষত্র, নক্ষত্রমালার কোন চিহ্ন নেই। বাতাস স্তব্ধ, ধারাপাত ক্ষান্ত। দূরে কাছে শুধু নিস্তব্ধতাকে নিবিড় করা ঝিঁঝিঁর অবিরাম কান্না আর কান্না।

ওরা প্রথমে ভাবতে চেষ্টা করল, ওরা এখন কোথায়, স্বাভাবিক থেকে কত দূরে? যখন পরিবেশ ও পরিপার্শ্বের ঝাপসা ধারণা হল, তখন, পুনর্বার একই ভয়ে বিপন্ন হতে হতে ওরা চকিতে মরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়াল, এবং ছুটল।

অতি পিচ্ছিল পথে যে কোন মুহূর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারে এমন সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ওরা সদ্য জেলের পাঁচিল ডিঙিয়ে দ্রুত ধাবমান কয়েদীর মতো তীরবেগে ছুটতে লাগল। ওদের মনে হল ওরা কয়েদী,

( বলাবাহুল্য ওরা কয়েদীই। ) ওরা সত্যি সত্যিই জেল থেকে পালিয়েছে। ওদের আরো মনে হল, ওদের পেছনে কারা যেন মুহুর্মুহু পাগলা ঘণ্টি বাজাচ্ছে। মনে হচ্ছে, এই বুঝি ঘণ্টার শব্দে সবাই জেগে উঠেছে, সমস্ত প্রহরীরা। এবং ওদের পুনর্বার ধরবার জন্যে ছুটে আসছে, জোরে, আরো জোরে, প্রায় ছুঁল বলে।

ওরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্লান্ত, অবসন্ন, অস্বাভাবিক হাঁফাচ্ছে। নিরুপায় অক্ষমের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে ওরা পিছন ফিরল। আশ্চর্য! কেউ নেই, কিছু না। এমন কি পায়ের সেই প্রগলভ শব্দও নয়।

ওরা পা বাড়াল। পেছনে পায়ের শব্দ হল। তা-হ-লে ?

ওরা হাসল। বিপন্ন ভয় ডিঙোন সরল বিস্ময়ের হাসি। মুহূর্তে মাথার উপরের আকাশ অসংখ্য নক্ষত্রমালায় ঝিকমিকিয়ে উঠল। বাতাস বইছে। ওরা স্থির হল। এবং স্থির হতেই ওরা অপরিমিত কৌতুক বোধ করল, যেহেতু ওরা সেই অবিরাম কোলাহল ও অসহনীয় কলঙ্কে উদ্বেল জনপদের দুঃসাহসী আবাসিক, সম্পন্ন এবং স্বচ্ছল ; যেহেতু ওরা অতিমাত্রায় সচেতন ও সদাসতর্কতার গৌরব দাবি করে ; যেহেতু ওরা সমস্ত জ্ঞানকে আপেক্ষিক ও সমস্ত অভিজ্ঞতাকে নিতান্ত তুচ্ছ এবং নিরর্থক বলে মনে করে।

আসলে তখনো ওরা সেই অগাধ অবাধ সমুদ্র থেকে অনেক দূরে, যে সমুদ্র একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ, যার ঢেউয়ের নীচে প্রাণ, প্রাণের বিরামহীন স্পন্দন—বলা যাক, এক সুদূর মগ্ন গভীরতা।

ক্রমে ওরা মাঠ ছাড়াল। মাঠ ছাড়াতেই উঁচু নীচু অজস্র টিলা। ওরা পর পর কয়েকটি টিলা ডিঙিয়ে আপাতত চলার মতো একটি অতিমাত্রায় সরু রাস্তায় পা দিল। রাস্তাটা আসলে কোনদিকে গেছে অর্থাৎ জনপদের কোলাহলের দিকে, না জনপদহীন কোন আরণ্যক অঞ্চলে, ওরা তার কিছুই আন্দাজ করতে পারল না, যেহেতু চতুর্দিকে

তখনো বিপুল অন্ধকার।

অবশেষে ওদের অবস্থা মরিয়া। ওরা ভাবছে কখন এই অনিশ্চিতির পথ ফুরবে, কখন ওরা রাত্রির মতো বিশ্রামের আস্তানায় পেঁছে পা ছড়াবে? যখন কোন কিছুই নিকটতর মনে হল না, যখন মনে হচ্ছে এই অন্ধকার পথ অন্তহীন, যখন আশাহীনতায় ওরা অবসন্ন, মরিয়া, তখন চকিতে একজোড়া আঙুল দিয়ে ওরা ওদের ভাগ্য নির্ণয়ের শেষ চেষ্টা করল।

আশ্চর্য! এই অদ্ভুত ভাগ্যপরীক্ষা বিস্ময়করভাবে ওদের দীর্ঘদিন লালিত গোপন এবং আনন্দদায়ক বিশ্বাসকে সহজে সমর্থন করল!

আসলে মানুষের দুর্বলতম মুহূর্তে সযত্নে বর্ধিত আশাগুলো কদাচিৎ বিশ্বাসের বিরুদ্ধতা করে। ফলে ওদের অন্ধবিশ্বাস ওদের এই আশা দিল যে, ওরা অতি সত্বরই একটি নিশ্চিত গন্তব্যে পেঁছবে। যদিও ওদের সম্মুখের পথরেখা সরু, পিচ্ছিল এবং আদৌ সুলক্ষ্য নয়, তবু এই পথই ওদের কাছে অনেকটুকু। তাই প্রতি মুহূর্তে পদস্খলনের অনিবার্য সম্ভাবনা সত্ত্বেও ওরা দ্রুত পা চালাতে লাগল।

এখন ঝিঁঝিঁর ডাক ছাড়া কোন শব্দ নেই, কোথাও না। ঘাসবন নিঝুম, বুনোঝোপ স্থির। দূর দিগন্ত অন্ধকারে ঢাকা।

ক্রমে ওদের কানে ঝিঁঝিঁর শব্দের অস্তিত্বও উচ্চারিত হল না। ওরা শুনছে শুধু ওদের পায়ে চলার শব্দ, এতক্ষণ যা শোনে নি। ওরা দেখছে অন্ধকার, স্পর্শ করছে অন্ধকার। ক্রমে অন্ধকার মূর্ছিত হল।

এখন কত রাত?

জানি না।

কোথায় চলেছ?

জানি না।

কেন চলেছ?

জা—নি—না···আ···আ···

অন্ধকার থরথর করে কেঁপে উঠল। শূন্য মাঠ পাশ ফিরল চকিতে। অজ্ঞতা সূচক সেই বিলম্বিত দীর্ঘ উচ্চারণ মাঠের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে অন্ধকার হয়ে গেল। আর সে মুহূর্তেই ওরা থমকে দাঁড়াল।

আ-লো-ও···ও··· ।

আলো দেখার যে উদ্দাম ইচ্ছা ওরা লালন করছিল মনে, প্রায় মরিয়া হয়ে উঠেছিল, ওরা হঠাৎ, হঠাৎই সেই আলো দেখল, দেখতে পেল, যদিও অনেক অনেক দূরে, স্থির অন্ধকারের সুদূর গভীরে, প্রায় বিন্দুর মতো, যেন নক্ষত্র বুঝি শূন্যে, আকাশ প্রদীপ হয়ত বা। না, আলোই। ওরা ভাবল, এই সেই আলো, যার ছলনাও এই দুঃসহ অন্ধকারে সুসহ, স্বাগত।

ওরা মানুষের সঙ্গ পাবার জন্য উন্মুখ হল।

আলোর আশায় ওরা শেষ পর্যন্ত যেখানে এসে পৌঁছল সেখানে চতুর্দিকে পাহাড় আর পাহাড়! আলোটা জ্বলছে পাহাড়ের গায়ে। ওদের স্বাভাবিক ভাবেই ধারণা হল, নিশ্চয়ই সেখানে মনুষ্য বসতি আছে, এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য। কিন্তু এই নিবিড় অন্ধকারে পাহাড়ে চড়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু, অথচ পাহাড়তলীও নিরাপদ নয়, যেহেতু আশে পাশে ঘন জঙ্গল, যেহেতু যে কোনো মুহূর্তে শ্বাপদের আবির্ভাব সম্ভব।

ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও মৃত্যুভয় যেখানে অন্তরঙ্গ, সেখানে দুর্গমও গম্য। সুতরাং যা থাকে কপালে এমনি দুঃসাহসে ওরা পা বাড়াল।

অনেকক্ষণ উদভ্রান্তের মতো ঘোরার পর ওরা পাহাড়ের রুক্ষ গা বেয়ে ওঠা প্রায় খাড়াই একটা সরু পথ ধরে অবসন্ন ও নিদারুণ ক্ষুধার্ত অবস্থায় সার সার বাঁশের উপর দাঁড় করান মাচাঙের ওপরের একটি দরমার ঘরের নীচে এসে দাঁড়াল, পাহাড়ী ভাষায় যাকে বলে টঙ্।

ওরা এখন স্পষ্ট দেখছে আলো, আলোর রেখা, ও সংখ্যাহীন আলোর

পোকা। ওরা নিজেদের সম্পূর্ণ অজান্তে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিল।

টঙে ওঠার মইটা রাত্রে তুলে ফেলা হয়েছিল বলেই নীচে দাঁড়িয়ে ডাকা ছাড়া ওদের গত্যন্তর ছিল না।
প্রথম ডাকেই যে বেরিয়ে এল সে আশ্চর্য সুন্দরী এক পাহাড়ী মেয়ে, বিরক্তিতে যার ভ্রূ জোড়া অতি মাত্রায় কুঁচকান, মুখে প্রবল প্রচণ্ড ঘৃণা, এবং চোখে তীব্র তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনা। ওদের বক্তব্য শোনার আগেই মেয়েটা ত্রস্ত পায়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।
যে মানুষের সংস্পর্শ থেকে মুক্তি পাবার আশায় ওরা জনপদের কোলাহল এবং কলঙ্ক পেছনে ফেলে এসেছিল, পরে যে মানুষের সঙ্গ পাবার আশায় মরিয়া হয়ে উঠেছিল, সেই ওরাই মানুষীর চকিত আবির্ভাবে ও তার আকস্মিক অন্তর্ধানে যুগপৎ বিস্মিত ও বিব্রত হল। যেহেতু ওরা উপায়হীন, বাইরে চতুর্দিকে অন্ধকার ভয়ংকরী, শ্বাপদের ভয় বিস্তর ; যেহেতু মৃত্যুকে ওরা ভয় করে, অথচ যাদের ধারণা, জীবন অর্থহীন, তবু জীবন রক্ষার আপাত প্রয়োজনেই ওরা মরিয়া হয়ে আবার ডাক দিল।
সে ডাক পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হল পাহাড়ে পাহাড়ে।।

৩

## আলো ছলনাময়ী

অতঃপর যে বেরিয়ে এল, যার মুখ অতিচারের ছাপে অতিমাত্রায় কদর্য, যার চোখ কুটিল, ক্রূর, এবং কোটরের গভীরের মৃদু অন্ধকারেও উজ্জ্বল ; যার ঠোঁটে ক্ষণে ক্ষণে একটি উদ্দেশ্যমূলক হাসি উঁকি মারছিল, যে একটু কুঁজো হয়ে দেখছিল আগন্তুকদের মুখ ও মুখের রেখা, সে ইশারায় তাদের দাঁড়াতে বলে চালার সঙ্গে খাড়া করা মইটা নামিয়ে দিতেই ওরা পায়ে পায়ে উঠে এল মাচার ওপরে, যেখানে তখনকার মতো স্বস্তি ছিল, সান্ত্বনাও।

ওরা আলোর নীচে এসে দাঁড়াল। আলোর রেণুতে ওরা সিক্ত হল, স্নিগ্ধ হল। বিশ্বচরাচরে এবং ওদের মনে যে বিপুল ব্যাপ্ত অন্ধকার প্রায় মৃত্যুর মতো নির্জনতার ও নৈঃশব্দ্যের ক্ষরণে এতক্ষণ দুঃসহ ছিল, এই স্বল্পবাক আলোর উচ্চারণ নিঃসন্দেহে তার ইতি ঘটিয়েছে, এবং এই অল্পালো অবশ্যই গূঢ়ার্থে বিশাল জলোচ্ছ্বাসের সহোদর। ওরা তাই পুনর্বার জনপদের অতি অল্পে খুশি সেই সব বিশৃঙ্খল মানুষের মতো হাস্যে উচ্ছ্বাসে উদ্ভাসিত হল।

সদ্য বিপদোত্তীর্ণ মানুষ যেভাবে আপন মর্মান্তিক অভিজ্ঞতাকে অন্যের গোচরীভূত করার জন্যে অতিমাত্রায় প্রগলভ হয়ে ওঠে ওরাও মুহূর্তে অনুরূপ প্রগলভ হল। বোঝাতে চাইল, মৃত্যু নামক সেই কুৎসিত, বীভৎস জন্তুটা কিভাবে ওদের তাড়া করে ফিরছিল, এবং সেই মানুষগুলো, যারা অবয়বে তাদের সগোত্র এবং জনপদের সূত্রে প্রতিবেশী, তারা কিভাবে ওদের ভুল সংবাদ দিয়ে ঠকিয়েছিল।

পাহাড়ী ওদের প্রগলভতায় একটুও বিরক্ত হল না, বরং মৃদু হাস্যে

সেই উজ্জ্বল প্রগলভতাকে প্রশ্রয় দিল।

ওদের উচ্ছ্বাস স্তিমিত হলে, ওরা পাহাড়ীকে যখন তার নাম জিজ্ঞেস করল, তখন সেই অতি কুৎসিত, অতি ভীষণ লোকটা তার যুগল দন্তপাটি বিকশিত করে হেসে যা জানাল তার অর্থ হল, এই মধ্যরাতে আমার নাম তোমাদের কোন লাভের কারণ হবে না, বরং আমাকে মামা বলেই ডেক। এবং সে জানাল পাহাড়ী জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী, বোঝাল, ওদের জীবন আদৌ সুখের নয়। এবং ক্ষণকাল জিরিয়ে সে ওদের নাম ধাম ও শিক্ষার খবর ইত্যাদি নিয়ে যখন জানল ওরা শহুরে, শিক্ষিত, অভিজাত, তখন যৎপরোনাস্তি খুশি হয়ে ওদের কাছে রাত্রিবাসের জন্যে, এবং রাত্রিবাসকালীন খাদ্যসহ সমুদায় ফূর্তির জন্য পঁচিশ মুদ্রা দাবি করে উচ্চৈঃস্বরে ডাকল—চেঙমারু! চেঙমারু!

দীর্ঘ পথ চলায় ক্লান্ত অবসন্ন ওদের কাছে মনে হল অন্ধকারের অন্তর্গত রহস্যের চাইতে প্রদীপের নিম্নবর্তী ছায়ার রহস্য আরো গভীর, কুটিল, হয়ত বা ভয়ংকর। নতুবা এত মুদ্রা বিনিময়ে কি অমলিন ফূর্তি এই মধ্যরাতে সম্ভব ওরা কিছুতেই ধারণায় আনতে পারল না। এবং না পারার জন্যেই ওদের রক্তে মনে এবং মগজে তীব্র এক কৌতূহল হঠাৎ ছাড়া পাওয়া ঘোড়ার মতো এলোমেলো লেজ তুলে ছুটে ছুটে ঘুরতে লাগল বিশৃংখল পা ফেলল এখানে সেখানে, কিন্তু প্রাসঙ্গিক সমস্যা সমূহ ওদের এত কাবু করেছিল যে, ওরা ভাবল, শুধুমাত্র আশ্রয় না হারানোর জন্যে এ মুহূর্তে ওদের উচিত অকুণ্ঠায় দাবী পূরণ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ওদের মনে পড়ল পাহাড়ীদের সেইসব গল্প, যে সব গল্পে খুন, জখম, লাস গুম করা ইত্যাদি মুহূর্তে মুহূর্তে ঘটছিল এবং আইন ওদের কেশস্পর্শও করতে পারছিল না। কি কর্তব্য, এই সিদ্ধান্তে পেঁছবার আগেই ওরা শুনল পাহাড়ী পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে ডাকছে—চেঙমারু! চেঙমারু।

সম্ভবত চেঙমারু পাহাড়ীর সহোদরা, সম্ভবত সে কুমারী, সম্ভবত কারো ঘরণী হবার আয়োজন অদ্যাবধি অসম্পূর্ণ। সেই অক্ষত যৌবনা, সেই হঠাৎ আবির্ভূতা বনজা, যার চোখে প্রথম দর্শনে ঘৃণা ছিল, প্রথম দৃষ্টিপাতে তীব্র ভর্ৎসনা ছিল, এবং তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা,—সে সশব্দ পদপাতে এল, দাঁড়াল যেন চিত্রাঙ্গদা রণবেশিনী, যেন উর্বশী স্বর্গের নটী, যেন উলুপী নাগকন্যা।

চেঙমারুর নাতিদীর্ঘ বন্ধুর দেহ ঘিরে আলো, আলোছায়ার এক আশ্চর্য শিল্প সৃষ্টি করছিল ওদের দৃষ্টির সম্মুখে। ওরা নিষ্পলক দেখছিল সেই সাবলীল শরীর, যার খাড়াই এবং খাদের ব্যবধান বিস্তর, এবং চেঙমারুর উসখুস ভাবের জন্য আলো ক্ষণে ক্ষণে ঢেউয়ের মতো ভাঙছিল! অর্থাৎ মুহূর্তের অস্থিরতায় খাড়াইয়ের শীর্ষ ছোঁয়া উজ্জ্বল আলো, আকস্মিকভাবে গড়িয়ে গড়িয়ে খাদের গভীরে স্থির হচ্ছিল। আসলে চেঙমারুর শরীর একটি নিখুঁত নারীদেহ, যার প্রতি রোমকূপে আকর্ষণ আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো। মনে হচ্ছিল চেঙমারু একটি তুবড়ি, যে আগুনের চকিত স্পর্শে সহস্র মুখে উৎসারিত এবং উদ্ভাসিত হবে। এবং ওদের মনে হল এই প্রবহমান লাবণ্যকে ওরা অস্বীকার করতে পারে না, অথচ ওরা বুঝতে পারছে না এ লাবণ্যের উপস্থিতি কেন? দ্বিধাগ্রস্ততার চূড়ায় দাঁড়িয়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে অনন্যোপায় ওরা পাহাড়ীর হাতে পঁচিশটা পরিচ্ছন্ন এক টাকার নোট সমর্পণ করে ভাবল, এ বিনিময় আশ্রয় ও খাদ্যের, এবং ওরা ত্বরিতে মুখ দেখল পাহাড়ী ও তার অবিনীতা সহোদরার।

আশ্চর্য! যদিও এ অঞ্চল বনস্থলী, পাহাড়ী, যদিও এখানকার আবাসিকরা বর্বর এবং অশিক্ষিত, তবু মুদ্রার সংক্রামক গরিমায় ওদের মুখ চোখ পলকের জন্যও উজ্জ্বল হল না। প্রায় স্বাভাবিক স্বস্তিতে, সন্দেহপ্রবণ দোকানীর মতো সন্দিগ্ধতায়, প্রায় বারনারী সুলভ কুটিল নজর রেখে পাহাড়ী প্রতিটি মুদ্রা পরখ করে উঠে দাঁড়াল।

চেঙমারু, যে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, যার চোখে মুখে এখনো এক সহস্র যন্ত্রণা স্থির, মুদ্রার সংক্রামক গরিমা যার মুখে ক্ষণেকের জন্যেও আলো হয়ে খেলে নি, চোখে খুশির রঙের কণামাত্র আভাস জাগায় নি, সেই চেঙমারু পাহাড়ীর উঠে দাঁড়ানোয় বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। সে যেন অনুভবহীন এক পাষাণ প্রতিমা। স্থির, অনড়। এবং চেঙমারুর এই নিস্পৃহতায় ওরা নিদারুণ বিস্মিত হল। ভাবতে চেষ্টা করল এই অবিকারের অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য। কিন্তু অনেক পরেও ওরা সেই অন্ধকারেই পড়ে রইল, যে অন্ধকারে ওরা ছিল।

পাহাড়ী পা বাড়াল। কিছুদূর এগিয়ে থমকে দাঁড়াল, হঠাৎ যেন একটি জরুরি কথা মনে পড়েছে এমনি ত্বরিত ভঙ্গীতে পিছন ফিরে, হেসে অতি মৃদু মিষ্টি গলায় যা বলল তার অর্থ হল, চেঙমারু এরা শহুরে, শিক্ষিত, এবং অভিজাত। বলেই পাহাড়ী মাচার অন্য প্রান্তবর্তী খুপরীর একটিতে ঢুকে গেল। স্বাভাবিক ভাবেই ওদের দৃষ্টি ওকে অনুসরণ করল। ওরা দেখল সেদিকে একটি সংসার। অনেকগুলো ছোট ও একটি বড় মুখ। ওরা চোখ ঘুরিয়ে নিল।

চেঙমারু তখনো দাঁড়িয়ে।

ওদের মনে হল মেয়েটি পাহাড়ীর একটি কথাও কানে তোলে নি, অথবা শুনলেও গ্রাহ্য করে নি। ওরা অবাক হয়ে বুঝতে চেষ্টা করল পাহাড়ীর কথার অন্তরালবর্তী তাৎপর্য, এবং বুঝতে চেষ্টা করল চেঙমারুর অসাধারণ নিস্পৃহতা।

ওরা অপলক দেখতে লাগল চেঙমারুকে।

আবার সেই শরীর, আলো, সেই আশ্চর্য আলোছায়া। আলো ভাঙছে, ছায়া শিল্প গড়ছে।

ওরা চেঙমারুর উজ্জ্বল শরীরে সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্যে চোখে হেঁটে বেড়াল। অনেক অনেকক্ষণ।

একজোড়া শিশু ওদের খাবার নিয়ে এল। ওরা চোখ নামাল চেঙমারুর

শরীর থেকে, এবং মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল খাবারের ওপর। ওরা বুঝল, ওরা কী ভীষণ ক্ষুধার্ত, অবশ্যই খাবার দেখে।

চেঙমারুকে অগ্রাহ্য করে ওরা গোগ্রাসে গিলতে লাগল।

চেঙমারু তখন একটি খুঁটিতে হেলান দিয়ে অন্ধকার দেখছে।

এক সময়ে ওদের খাওয়া শেষ হল। সেই যুগল শিশু মাটির বাসনগুলো সরিয়ে নিয়ে সেই খুপরীগুলোর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতেই, ও-প্রান্ত অন্ধকার হয়ে গেল। এ-প্রান্তে ওরা আর চেঙমারু। প্রদীপ জ্বলছে।

চতুর্দিকে নির্জনতা। ক্রমে ঘনভার সেই নির্জনতা ওদের গ্রাস করল। ওরা অবশ হল, বিষণ্ণ হল, তাকাল চেঙমারুর দিকে।

কে যেন সেই প্রবহমান লাবণ্যকে ভাঁজ করে রেখেছে। ওরা দেখল প্রতিটি ভাঁজের মুখে কি যেন কী উন্মুখ হয়ে রয়েছে। ওরা চোখ দিয়ে লেহন করল, মনে মনে আলিঙ্গনও। ক্রমে ওদের ঘিরে এক দুঃসহ উত্তেজনা। অনায়াসে ওরা উত্তেজনার শিকার হল।

দুর্দৈব যতক্ষণ ওদের সঙ্গী ততক্ষণ ওদের সাহসের সঞ্চয় ছিল অতি অল্প। ফলে ওদের ভাবনার মধ্যে ঐক্য ছিল, আশ্চর্য মিল। ওদের অস্তিত্ব ছিল একটি, দেহে মনে ওরা ছিল অন্তরঙ্গ। কিন্তু আলোকিত নির্জনতার মধ্যে, আশ্রয়ের সাহসী উত্তাপের মধ্যে, ক্ষুধাতৃপ্তির সুনিশ্চিত সান্তবনার মধ্যে ওদের ভাবনা ক্রমে দুই হল, প্রায় উত্তর দক্ষিণ, প্রায় আকাশ মাটি, আলো অন্ধকার, দিন রাত্রি।

ওরা ভিন্ন হল।

ভাবনার দুই পৃথক এবং বিশিষ্ট অস্তিত্ব, দুই পরস্পর বিরোধী সত্তা। এবং একে অন্যকে সবিনয়ে শুধল, তুমি কোথায় চলেছ?

উদ্ধত প্রত্যুত্তর এল, নরকে!

কোথায়?

ন-র-কে। বুঝেছ?

কিন্তু তুমি যে কথা দিয়েছিলে যাবে না, কোনো দিন, কখনো নয়।

কথা দিয়েছিলাম? তাই নাকি! সে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল।

'সে' নরকে যাবে, সে আগেও যেত, সে নরক-বিলাসী, সে নারকী। সে কেন যায় 'আমি' জানতাম, আমি জানি। সে বহুবার সেখানে গেছে, যাবে। সে যাবেই। কিন্তু সে বলেছিল, আর যাবে না। কেন বলেছিল?

অন্ধকারের সহস্র বাহু, সে জানত।

নরকের পথ মসৃণ, আমি জানতাম।

শহরের সেই বিস্তীর্ণ, বীভৎস, কুৎসিত কোলাহলে, কলঙ্কের প্রগলভ মলিনতায় যেখানে প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি মহিলা, প্রগলভ যৌবনা কুমারী, অতি বিন্যস্ত এবং অবিন্যস্ত বেশবাসে, চলা বলায় মনে করিয়ে দিত যে তারা রমণী কামিনী নটিনী,—সেই শহরের অন্তর্গত নরকে যেখানে থাকে রমণী, কামিনী এবং নটিনী, যাদের আবরণ নিরাবরণ হবার জন্যেই, যেখানে বাঘের থাবাও প্রায় অহিংস এবং বাঘের হিংস্র চক্ষুও দুর্লভ নয়; যেখানের প্রাথমিক অনুভব ঘৃণা, ক্রমে মোহ এবং বিকৃত মৃত্যু. সে সেই বেলেল্লাপনায় উদ্দাম নরকের গলিত অন্ধকারে অকস্মাৎ ডুবে যেত, মগ্ন থাকত ঘুঙুরের উচ্ছ্বলিত উচ্চারণে, ছলকে পড়া আপাত মিষ্টি আওয়াজে—কখনো এক ঋতু, অথবা তারও বেশী, আরো বেশী দিন।

হয়ত সুখ ছিল। সে বলত, মরণপুলক। আমি সে পুলক বুঝতাম না। একদিন তার মগ্নতা, যে মগ্নতা বিশ্বকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল, আমাকেও, তার সেই নরকে মুখ গুঁজে থাকা মোহময় মগ্নতা ভাঙত। সে ফিরে আসত। তখন সে জ্বলে জ্বলে অঙ্গার। বলত, শুদ্ধ হয়ে এলাম। চোখাচোখি হলেই স্পষ্ট ধরা পড়ত তার শ্রীহীনতা; অনুজ্জ্বল, অনুদ্দাম এক দেহ—যে দেহ অতিচারে ক্লান্ত, অবসন্ন, রিক্ত। তার

দৈন্য তখন স্পর্শসহ। মনে হত, সে এক শূন্য, অন্তহীন শূন্যতা। সে বলত, আমি ঘুমব অগাধ অবাধ ঘুমে। সে ঘুমতও। আমি ঘুম ভাঙাতাম না। আমি জানতাম ঘুম মৃত্যুর বিকল্প, প্রায় মৃত্যুর মতোই। ঘুমের অস্তিত্বে সংগ্রামহীন স্বস্তির প্রশ্রয় আছে।

যেহেতু ঘুম নিরবধি নয় মৃত্যুর মতো, অথবা সময় প্রবাহের মতো, সেহেতু একদিন তার ঘুম ভাঙত। জেগে উঠত অতি মাত্রায় স্বাভাবিক একজন হয়ে। তখন তার মধ্যে অভাবিত কোন অস্থিরতা, অথবা চাঞ্চল্য, অথবা উন্মত্ততার কোনো চিহ্ন থাকত না। সে যেন মাঘের মধ্যদিনের সূর্য, খরও নয়, ঠান্ডাও নয়। কিন্তু প্রাকৃতিক ঋতুবদলের মতো তারও ঋতু বদল হত। শীতের পরে তার দেহে মনে আবার বসন্ত আসত, প্রখর জ্যৈষ্ঠ। তখন সে আরো লেহি লেহি, আরো উদ্দাম, যেন দাবাগ্নি শিখার এক সর্বগ্রাসী প্রবাহ।

যেহেতু আমি তার অন্তরঙ্গ, ঘনিষ্ঠ, এমন কি অতি নিকট অস্তিত্ব সম্পর্কের আত্মীয়, সেহেতু, শুভ ইচ্ছায় উদ্বুদ্ধ আমি মরিয়া হয়ে বাধা দিতাম। বলতাম, আর নয়।

সে শুনত না।

নরকে সে যায়, সে যাবেই, তাকে ঠেকানো যাবে না, যায় নি, আমি পারি নি, জানি এখনো পারব না। অথচ সে কথা দিয়েছিল, যাবে না। কেন দিয়েছিল ? আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। সে উঠে দাঁড়াল, ক্রমে ক্রমে চেঙমারুর মুখোমুখি, পাশাপাশি, ঘনিষ্ঠ।

মুহূর্তে বিশাল অন্ধকার বিদীর্ণ করে লেলিহান দাবাগ্নিশিখা ও গাছ-পাতা পোড়ার এলোমেলো শব্দে দিকবিদিক আলোকিত ও মুখরিত হল। আমি দেখলাম পাহাড়ে আগুন দিয়েছে। চমকে উঠে দাঁড়ালাম। চেঙমারু ও সে, যারা পরস্পর পরস্পরের হাত ধরে আছে আমাকে উঠতে দেখেই চেঙমারু হাসল, বুঝল আমার মনোভাব, অতি মৃদু গলায় বলল, ভয় নেই, জঙ্গল পুড়িয়ে জমি তৈরী হচ্ছে, চাষ হবে।

চাষ ! আমি চেঙমারুর চোখে চোখ রাখলাম ।

চেঙমারু আর নিস্পৃহ নয় । আমি আবার বসে পড়লাম । চেঙমারু আর সে এগিয়ে এসে আমার পাশে বসল । বলল, আলোটা নিবিয়ে দিই ।

আমি কিছু বলার আগেই সে বলল, দাও ।

চেঙমারু উঠে দাঁড়িয়ে আলো নিবিয়ে আবার এসে বসল ।

এখন অন্ধকার । দূরে আলো অগ্নি হয়ে উদ্দাম । যেন খাণ্ডবদহন হচ্ছে ।

আমি সন্তর্পণে ওদের তফাতে সরে গেলাম । চেঙমারু স্পষ্ট দেখল, এবং মুহূর্তে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল । বলল, সে কী ?

না, না, আমি আগুন হব না, পতঙ্গ হব না, আমি খাণ্ডব দহনে অরাজী । আমি নরক চিনি না, নরক চাই না, আমি নরকে যাব না ।

আমি মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম । অন্ধকারে স্পষ্টই মনে হল, চেঙমারু নরক, অতি প্রাচীন অভ্যস্থা নরক, যেখানে ইতিপূর্বে অনেকে ডুবেছে । এবং আমি স্পষ্টই বুঝলাম, কেন মুদ্রা কোন বিকার উপঢৌকন দেয় নি ।

সে সেই নরকে ডুববে, আমি জানি । আমি আরো আরো তফাতে সরে গেলাম ।

সে চেঙমারুর কোলে মাথা রেখে শুয়েছে । চেঙমারু বিলি কাটছে তার মাথায়, হাত বুলচ্ছে গালে । সে চেঙমারুর একরাশ কালো চুলে তার একজোড়া হাত ডুবিয়ে অস্থির, চঞ্চল ।

আমি আগুন দেখছি ।।

## ৪
## বীভৎস

ভরা কোটালের সমুদ্র যেভাবে ডাঙাকে গ্রাস করে, তরঙ্গে তরঙ্গ ভঙ্গে উদ্দাম উন্মত্ত হয়ে ওঠে, দাউ দাউ আগুন তেমনি গ্রাস করল পাহাড়-শ্রেণীকে, সে বেষ্টন করল চেঙমারুকে। তারপর লেহি লেহি অনর্গল শিখা সাপের মতো ফণা মেলে স্পর্শ করল পাহাড় সমূহের চূড়া। এক সময় পাহাড় নিশ্চিহ্ন হল স্বতঃস্ফূর্ত আগুনের সর্বগ্রাসী আলিঙ্গনে। বিস্ময়ে বিপন্ন হতে হতে আমার মনে হল, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। চোখ মেলে তাকাতে চাইলাম, পারলাম না। প্রাণপণে শ্বাস নিতে চেষ্টা করলাম, সম্ভব হল না। হঠাৎ মনে হল, আমার মস্তিষ্কের কোষে কোষে কে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আমি আর বসে থাকতে পারলাম না, ঢলে পড়লাম।

দেখলাম আমি একটি দীর্ঘ সিঁড়ির জটিল বাঁক ভেঙে ভেঙে ক্রমে উপরে উঠছি। আশেপাশে ছড়ানো একটি বিশালকায় পোড়ো বাড়ির এলোমেলো কড়ি বরগা, ইট, কাঠ, পাথর, হেলে পড়া খিলান, দরজা, জানালা, অজস্র জঞ্জাল। এখানে ওখানে পরস্পর বিরোধী অজস্র রেখা আশ্চর্য এক আকর্ষণে পরস্পরকে জড়িয়ে জড়িয়ে জটিল চিত্রের অবয়ব নিয়ে স্থির। আমি দেখতে দেখতে দ্রুত সিঁড়ি ভাঙছি। ক্রমে ঊর্ধ্বে আরো ঊর্ধ্বে। কোথাও আলো নেই, অন্য কোন বর্ণালীও নয়, শুধু নিকষ কালো আর কালো।

হঠাৎ একটি গাঢ় নীল বরফ ঠাণ্ডা হাত আমাকে স্পর্শ করতেই আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। স্থির, অনড়। আমি সম্মুখে তাকালাম। দেখলাম অন্ধকার অপসৃত। এক বিশাল বিস্তীর্ণ স্ত্রী-চিহ্ন বিকট বিস্তার নিয়ে আমার সম্মুখে একটি স্থিরচিত্র। আমি আঁতকে উঠলাম ভয়ে,

বীভৎসতায়। মরিয়া হয়ে আকাশ, আকাশের নক্ষত্রমালা দেখতে চোখ তুললাম। আশ্চর্য! বিশালকায় সেই স্ত্রী-চিহ্ন মুহূর্তে আকাশ গ্রাস করল। আমি বিমূঢ় বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিপাতে স্পষ্ট দেখলাম, তার অভ্যন্তরে অজস্র ক্ষত, ক্ষতগুলো থেকে অবিরাম রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমি শিউরে উঠলাম। ক্রমে সেই স্ত্রী-চিহ্নে এক গভীর গুহার সৃষ্টি হল। দেখলাম সেখানে প্রগাঢ় অন্ধকার অসহ অস্থিরতায় মাথা কুটছে। আকস্মিকতার ঘোর কাটতেই আমি মূক হতবাক। দেখলাম অজস্র ধোঁয়া বেরুচ্ছে সেই গুহামুখ থেকে। ক্ষণপরে ধোঁয়াগুলো আশ্চর্য সাবলীলতায় আগুনে রূপান্তরিত হয়ে আমাকে গ্রাস করতে এল। আমি পড়ি মরি দৌড় দিতেই সেই ঠাণ্ডা নীল হাত আমাকে বাধা দিতে চেষ্টা করল। নিরুপায় আমি লাফ দিলাম।

সেই পোড়োবাড়ি, ইট, কাঠ, খিলান, অজস্র পরস্পর বিরোধী সরল রেখার জটিল ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, সেই আশ্চর্য সিঁড়ি, সব সব কিছুই কোথায় পলকে মিলিয়ে গেল। আতঙ্কে আনন্দে আমি দৌড় দিতেই দেখলাম, সে, যে আমার অস্তিত্বের ঘনিষ্ঠ অংশ, যে একটু আগেই নরকে গেছে, সে বিশাল দেহ একটা সাপ হয়ে আমার পথ রোধ করে দাঁড়াল। আমি চীৎকার করে বললাম, সরে যাও।

সে সরল না।

ক্রমে সে দীর্ঘ দেহের উপর দাঁড়িয়ে ফণা তুলল, সে-ফণা স্পর্শ করল আকাশ। বিকট হাঁ করে সে গিলতে এল আমাকে। আমি ত্বরিতে লুটিয়ে পড়লাম ধুলোয়। মুহূর্তে ধুলো হয়ে গেলাম। সে, সেই ধুলোর উপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল। আমি পরক্ষণেই মাথা তুলে দেখলাম, সে ক্রমে বিশ্রী একটা আগুনের রেখা হয়ে জনপদের কোলাহলের দিকে চলে যাচ্ছে। আমি ভয়ে থরথর কেঁপে উঠলাম। ভাবলাম হয়ত এই আগুনে সমস্ত বিশ্ব-সংসার ভস্ম হয়ে যাবে। আমি উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায় নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলাম, বললাম, ভগবান! এবারের

মতো বাঁচিয়ে দাও। কিন্তু আশ্চর্য বিস্ময় অপেক্ষায় ছিল আমার। আমি দেখলাম, স্পষ্টই দেখলাম, জনপদের মানুষ সেই আগুনের শিখাকে একটুও ভয় করল না। বরং জনপদের সেই মানুষগুলো নিপুণ তৎপরতায় নিজের নিজের প্রায় নিবন্ত মশালগুলোকে সেই আগুনে দ্রুত ধরিয়ে নিল।

আমি এই সর্বনাশা দৃশ্য দেখতে দেখতে অবশ হয়ে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে তলিয়ে যাচ্ছি কোন নিতল অন্ধকারে। ভয়ে, উদ্বেগে আমি প্রাণপণে আবার চীৎকার করে উঠলাম।

মুহূর্তে আমার মোহাচ্ছন্নতা ঘুচে গেল। আলো। দেখলাম ভোর হয়েছে। চতুর্দিকে গলে গলে পড়ছে সবুজ রৌদ্র। আমি চোখ মেলে উঠে বসলাম।

এত মানুষ !

আমি চোখ রগড়ে ভাল করে তাকালাম। সত্যি অনেক মানুষ। মানুষের ভিড়ের মধ্যে জনকয়েক পুলিশ। এবং দেখলাম, সে আমার দিকে অপলক তাকিয়ে রয়েছে। চোখে মুখে গত রাত্রির বিপুল ক্লান্তি। আমি চোখ সরালাম না। স্পষ্ট দেখলাম, সে বলছে, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো। চোখ ঘুরিয়ে নিলাম, চেঙমারু অথবা পাহাড়ীকে কোথাও দেখলাম না। বুঝতে পারলাম না কেন এত ভিড়, কী অঘটন ইতিমধ্যে ঘটেছে। আমাদের অবস্থা সম্যক হৃদয়ঙ্গমের আগেই পুলিশ আমাকে হাতকড়া পরিয়ে দিল। প্রতিবাদ করতে উদ্যত হতেই, পুলিশগুলো প্রচণ্ড ধমকে আমাকে চুপ থাকতে বলে ইশারা করল ওদের আদেশ পালনে।

আমি অনুসরণ করলাম।

সেও।

তখন রৌদ্র পাহাড়ে, পাহাড়তলীতে ফুলের উষ্ণতা ছড়াতে ব্যস্ত। আমি সেই রৌদ্রের ওপর দিয়ে ভয়ে ভয়ে হেঁটে চললাম। আর ভাবছিলাম কেন শুধু আমাকেই গ্রেপ্তার করল ? কেন ? আমি চোখ তুললাম। আশ্চর্য ! 'সে' ভিড়ের একজন হয়ে হাঁটছে ।।

৫

## চক্রব্যূহে

অন্ধকারের অনুভব আর আলোর অনুভবে যে প্রভেদ মৌলিক, ব্যবধান বিস্তর, প্রায় সূর্যোদয় সূর্যাস্তের মতো, থানার এলাকায় পা দিয়েই আমি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করলাম।

অর্থাৎ গতরাত্রে যে অঞ্চলকে বিরল বসত এলাকা বলে মনে হয়েছিল, বরং বলা যাক, ভাবতে বাধ্য হয়েছিলাম, রৌদ্রালোকে সেখানে লোকারণ্য দেখে আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় হলাম। আসলে এত ভিড় আমি কল্পনাই করিনি। আমার ধারণা ছিল, পাহাড় এলাকা লোকবিরল। জনপদ বলতে যে ঘন বসত এলাকা বোঝায় এখানে সেরকম কিছু অসম্ভব। কিন্তু আমার সমস্ত ধারণাই পাল্টে গেল। বুঝলাম, যদিও শহর আর পাহাড়তলীর ব্যবধান অনেক, দূরত্বও, তবু এখানের কোলাহল শহরের তুল্যমূল্য, এবং কলঙ্কও স্বল্প নয়। সুতরাং আমি সবিশেষ শঙ্কিত হলাম।

সেই বহু মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টি ছুঁয়ে ছুঁয়ে সেপাইদের পিছু পিছু আমরা থানার মাঠে পা দিলাম। ইতিমধ্যে আমি বিচ্ছিন্ন কিছু কথা শুনলাম, দেখলাম, অনেকটুকু জায়গা জুড়ে ছড়ান অনেকগুলো দোকানঘর, ছাউনী। বুঝলাম এখানে হাট বসে, এবং থানার অবস্থিতি হাটের পাশেই। অবশ্য আমি সে সমস্ত দোকানগুলো দেখেছি যেখানে

চা বিক্রি হয়, এবং সে দোকানগুলোতে খদ্দেরের অস্বাভাবিক ভিড় ছিল। আমার মনে হয়েছিল ঠিক শহুরে লোকেদের মতো এরাও হয়ত চা দিয়ে মুখ ধোয়, এবং অনর্গল সিগারেট টেনে মগজ তৈরী করে। শুধু এই নয়, থানার বারান্দায় পা দেবার একটু পরেই বিশ্রী শব্দ করে একটা বাস এল, যে বাসগুলো সোজা শহরে যায়। ফলে আমি বিমর্ষ হলাম, ব্যথিত। এবং মুহূর্তে আমার মনে হল. একালে হয়ত পালান যায় না; কোথাও, কোনো দূরত্বে না। যেখানে যতদূরেই তুমি যাও. সেখানে সেই সুদূরে, দূষিত হাওয়ার অভাব নেই; এবং সেই অমল শুদ্ধতা বুঝিবা সোনার পাথর বাটি, সে হয় না।

এই মনোভঙ্গজনিত আকস্মিক বেদনায় বিব্রত ও ব্যস্ত হয়ে ওঠার পূর্বেই আমাকে থানা ঘরে ঢোকান হল, যেখানে ছোটবাবু, বড়মুন্সী. ছোটমুন্সী ও অন্যান্য সেপাই-সুবোরা তীব্র কৌতূহল ও অগাধ খুশি মনে দাঁড়িয়েছিল। শিকার নাগালের মধ্যে এলে ব্যাধবৃন্দ যেরকম উত্তেজনাময় স্বস্তি ও উৎসাহে হাত বাড়ায়, সেই থানান্তর্গত শান্তি-রক্ষকসমূহ তেমনিভাবে কয়েক পা এগিয়ে এল।

ওদের চোখে মুখে শ্লেষ তীক্ষ্ণ হাসি হয়ে খেলছিল। 'এইবার মজা বোঝ' এমনতর একটি কথা যেন ওরা বলবার জন্য উসখুস করছিল। কিন্তু সে-কথা না বলে সেপাইদের একজন আরেক জনকে বলল, বেশ দেখতে। বড়বাবু খুশি হবেন রে!

কথাগুলো বেশ জোরেই বলল এবং তক্ষুণি ছোটবাবু সেই সেপাইদের কপট ধমক দিতেই ওরা সরে গেল কিছু দূরে, তফাতে! আমি এই কথা সমূহের গূঢ়ার্থ স্পষ্ট না বুঝলেও অনুমান করলাম যে কথাগুলো শ্লীল নয়। আমি ঘৃণায় সংকুচিত হলাম। আমার তৎক্ষণাৎ মনে পড়ল শহরের কথা, শহরবাসের কথা। বিকার, বিকৃতি—আমি ভাবলাম।

যে সেপাইটা আমার হাতকড়ার সঙ্গে বাঁধা লম্বা দড়িটা এতক্ষণ ধরে ছিল, ছোটবাবু অর্থাৎ ছোট দারোগার ইশারায় দড়ি ছেড়ে দিয়ে সে হাঁফ ছেড়ে সরে দাঁড়াল, যেন সে ঝামেলা মুক্তির স্বস্তি পেয়েছে,

এবং ছোটবাবু অন্য একজনকে কি এক ইঙ্গিত করতেই সে ত্বরিত গতিতে ছুটে একখানা টুল এনে আমার কাছে রাখল।

ছোটবাবু সবিনয়ে, অতিমাত্রায় ভারি গলায় বললেন, বসুন। আমি যেন আকাশ হাতে পেয়েছি এমনি পুলকে বসতেই টুলসহ আমি মেঝেয় গড়িয়ে পড়ে গেলাম। সমবেত লোকজন ও সেপাইরা মায় ছোটবাবু, সবাই উচ্চহাস্যে ফেটে পড়লেন। আমি বুঝলাম, আমি অতিথি নই, আমি আসামী। এবং গা ঝেড়ে ওঠার চেষ্টা করতেই ছোটবাবু ত্বরিতে আমাকে মেঝেয় বসতে হুকুম দিলেন। অগত্যা আমি মেঝেতেই বসে রইলাম, কিন্তু বুঝলাম না কেন, কি জন্যে, কি দোষে, আমার সঙ্গে আসামীর মতো ব্যবহার করা হচ্ছে ?

আসলে আমি জানি না, কেন আমাকে গ্রেপ্তার করল, কেন হাতকড়া পরিয়ে আমাকে, শুধু আমাকেই থানায় নিয়ে এল। যদি শহরের সেই সমস্ত ঘটনা ঘটানর জন্যে হয়, আমি ভাবলাম, তাহলে ব্যাপার খুবই জটিল। যদি তা না হয়, তাহলে ? কিন্তু সুদূর শহরে ( সত্যিই কি সুদূর ? ) যা ঘটেছে তা এদের জানার কথা নয়, যদি জানেও তাহলে গ্রেপ্তারের সপক্ষে প্রমাণ কোথায় ? অবশ্য অনুমানের উপরও গ্রেপ্তার সম্ভব। সুতরাং আমি আপাততঃ মূক থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করলাম। কিন্তু ভয় এবং উদ্বেগে আমি এত কাতর ও বিব্রত যে ( যেহেতু আমার মনে পাপ ছিল, আছে ) প্রায় বাধ্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

একজন সেপাই জিভ ভেঙচে বলল, সময় হলে ঠিক জানতে পারবে বাছাধন।

'সময়' কথাটা আমার মনে হঠাৎ তীব্র এক ধাক্কা দিল। আমি মনে মনে বার বার উচ্চারণ করলাম, সময়, সময়, সময়। অগত্যা সেই আশ্চর্য সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে করতে আমি ভাবলাম, যেহেতু সমস্ত ব্যাপারটাই সরকারী, এবং সরকারের বিশ্বস্ত কর্মচারীদের তদন্ত সাপেক্ষ সেহেতু যথার্থ সত্য জানার জন্যে, অথবা মিথ্যে, অনেক অনেক

সময়-হরণ বাধ্যতামূলক।

আসলে সরকার এবং সরকারী কর্মচারীরা জানে যে, কর্ম সম্পাদনে যত বিলম্ব ঘটবে, ততই কর্ম গুরুত্ব অর্জন করবে ; ওপর মহল বুঝবে ব্যাপার খুবই জটিল এবং দুরূহ, নতুবা বিলম্বের অন্য কোন হেতু নেই। তাছাড়া সরল যদি হবেই তাহলে সরকার এবং সরকারী কর্মচারী এর মধ্যে মাথা গলাবে কেন ? কাজে কাজেই প্রারম্ভে ধরে নেয়া হয় ব্যাপার মারাত্মক, নিতান্তই শাসন-কর্তৃপক্ষের পক্ষে অবমাননাকর ও ক্ষতিকর। সুতরাং ধৃতব্যক্তি দোষী কী নির্দোষ এই গূঢ় ও গভীর প্রশ্নের মীমাংসা হবার বহু পূর্বে থেকেই প্রাথমিক শাস্তি চলতে থাকে, কেন না শাস্তি দেওয়াই শাসনরক্ষার শেষ কথা। অর্থাৎ এর দ্বারা বোঝান সহজ হয় যে কর্তৃপক্ষ ঘুমিয়ে নেই, তারা সক্রিয় এবং সতর্ক। সুতরাং সেই 'সময়' না আসা পর্যন্ত আমি অবিচল থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম।

ইতিমধ্যে বেলা ক্রমে বাড়ছে, অথচ রহস্যের মুখ তেমনি বন্ধ, ফলে সমবেত লোকজন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্থানত্যাগে উদ্যোগী হল, এবং হয়ত মনে মনে স্থিরও করল, স্নানাহার অন্তে পুনঃ ভিড় করা যাবে।

সমবেত লোকজন অপসৃত হল।

আসলে বড়বাবু মহকুমা শহরে গিয়েছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে এমন গুরুত্বপূর্ণ আসামীর জেরা করার দায় নেবার সাহস কারো ছিল না, এমন কি ছোটবাবুরও নয়।

বেলা মাথার 'পরে স্থির হলে, স্থির, বড়বাবু ফিরলেন ক্লান্ত, বিরক্ত, তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে। এবং থানাঘরে ঢুকে আমাকে দেখে, আমার দিকে কুটিল কটাক্ষ হেনে ছোটবাবুর দিকে তাকাতেই ছোটবাবু কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন কি বলতেই বড়বাবুর ভ্রূজোড়া কুঁচকে গেল, চোখ ছোট হল, মুখ ডালিমের, পাকা ডালিমের রঙ পেল। ক্রমে চোখ বড় হল, আবার ছোট, এবং বিকট হুংকার ছাড়লেন খাসা হিন্দীতে,

শালাকো গারদমে ডালো। আমি ভয়ে, বীভৎস ভয়ে, পলকে ফ্যাকাশে হয়ে গেলাম, নিরক্ত।

যেই হুকুম, সেই কাজ। সেপাইরা সক্রিয় হল, যেন যন্ত্র। ত্বরিতে আমাকে হাজতের প্রগাঢ় অন্ধকারে গুঁজে দিয়ে দরজায় বিরাট একটি তালা ঝুলিয়ে ওরা, সেপাইরা, স্ব-স্ব স্থানে চলে গেল। আমি স্থির হতে চেষ্টা করলাম, ভাবলাম, এতক্ষণে সেপাইরা নিশ্চিন্তে পানাহার করবে, দুপুরের বিছানায় শুয়ে আড়ামোড়া ভাঙবে, ঘুমুবে, আমি ভাবলাম ।।

৬

## স্বগত চিন্তা

যেহেতু আপন সংকটে আত্মচিন্তাই প্রধান অর্থাৎ মুখ্য, পার্শ্ববর্তী অথবা প্রতিবেশী চিন্তা গৌণ, সেহেতু ভাবনার মুখ মুহূর্তে 'আমি' নামক অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে অজস্র বৃত্ত রচনায় ব্যস্ত হল। যদিও সমস্ত বৃত্তসমূহের কেন্দ্রে আমি, এবং এই আমির কেন্দ্র থেকে বৃত্ত-রেখার দূরত্ব যদিও নির্দিষ্ট নয়, এমন কি কখনো কখনো একই দূরত্বের বহুবার বৃত্তগড়ার চেষ্টায় বৃত্তরেখা অবয়বে পুষ্ট হচ্ছিল, এবং আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও দূরত্বের তর-তম ঘটানো সম্ভব হচ্ছিল না, ফলে প্রায় সব ভাবনাগুলোই, যেগুলো অতীত ও বর্তমানের, কেমন যেন অবলীলায় জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। এবং কিছুতেই বৃত্ত ভেঙে আমি কোনো ত্রিকোণ, চতুষ্কোণের অথবা আরো বেশী কোণ সমন্বিত জটিল কোনো অবয়বে পেঁছিতে পারছিলাম না। অথচ আমি জানি, কোনো আমিই শুদ্ধবৃত্তের পরিধিতে স্থির নয়, এবং সততা সত্ত্বেও অতীত সংঘটন সমূহের শুদ্ধরূপ স্মরণ অসম্ভব. যেহেতু কালের ব্যবধানে বহুতর পরিবর্জন ও পরিবর্ধন স্বাভাবিক। সুতরাং কি কি ঘটেছিল, এবং কেন ঘটেছিল, তার স্থূল সংবাদ পরিবেশন সম্ভব হলেও সূক্ষ্ম কোনো বিবৃতি অসম্ভব। অথচ আত্মপক্ষ সমর্থনে খুঁটিনাটি তথ্যও যে কি পরিমাণে প্রয়োজন আমি অনুভব করলাম যখন আমি স্থির করলাম, আমি সত্য বলব। বলাবাহুল্য এ মুহূর্তে

সত্যের সংজ্ঞা আমার কাছে এক এবং অদ্বিতীয় অর্থাৎ যা মিথ্যা নয়। কিন্তু দেশভেদে কালভেদে তার রূপান্তর ঘটে, সংজ্ঞার বদল হয়, অর্থাৎ আপেক্ষিকতাকে সজ্ঞানে প্রশ্রয় দিতে হয় আমি জানি বলেই, আমার ইচ্ছা ও আমার প্রকাশে এক মৌল বিরোধের সৃষ্টি হল, যার ফলে আমি স্পষ্টই এক দুরূহ জটিলতার সম্মুখীন হলাম। মনে হল, আমি যাই-ই বলব তাতে সত্যের শুদ্ধতা হয়ত বজায় থাকবে না, হয়ত প্রেক্ষিতের পরিবর্তন হবে। অথচ এদিকে সময় সংক্ষিপ্ত, হয়ত এক্ষুণিই জেরার মুখোমুখি হতে হবে। সুতরাং আমি অতি দ্রুত নিজেকে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম।

প্রথমে ভাবলাম, কেন আমাকে গ্রেপ্তার করল? কেন 'সে' মুক্ত। যদি ধরে নিই ওরা শহরে সংঘটিত সেই সমস্ত ঘটনার কথা জানতে পেরেছে, তাহলে, সাহায্যকারী হিসেবে সে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত থাকতে পারে না। কারণ, সে যদি আমাকে সাহায্য না করত 'তাহলে' আমার একার পক্ষে পাঁচ-পাঁচজনকে খুন করা কিছুতেই সম্ভব হত না। বরং বলা যায়, সে যদি সাহায্য করতে অরাজী হত, তাহলে আদৌ কাউকে খুন করতে পারতাম আমি মনে করি না, যেহেতু আমি সন্দেহপ্রবণ, স্বভাব-দুর্বল, ভীরু, সংশয়াচ্ছন্ন। এছাড়া খুন করার মতো মানসিকতা আমার মধ্যে অনুপস্থিত। আমি বড় জোর তাদের মৃত্যু কামনা করতাম, বড় জোর তাদের এড়িয়ে চলতাম। অর্থাৎ আমার বক্তব্য এই যে, আমরা উভয়ে এ ব্যাপারে সমান দায়ভাগী। বলাবাহুল্য, দায় সমান হলে, দোষও সমান হতে বাধ্য। সুতরাং আমি গোড়াতেই ভাবলাম, জেরার শুরুতেই এ সত্যকে স্পষ্ট করতে হবে। অবশ্য ভয় থেকে, অথবা শাস্তির ভয়ে আমি একথা ভাবি নি, ভাবছি না। আসলে সত্যের জন্যই আমার এই উদ্যম।

এবং আমি ভাবলাম, আমি কি কি বলব,—যদি জিজ্ঞেস করে, কেন খুন করেছি? যদি জিজ্ঞেস করে, ওরা কি এমন দোষ করেছিল যে, যার জন্যে খুন করার মতো আদিম মনোবৃত্তিকে অবলীলায় প্রশ্রয় দিলাম?

বলাবাহুল্য, সে জবাবগুলো এমন কিছু কঠিন অথবা জটিল নয়। অর্থাৎ পয়লা নম্বরকে খুন করেছি কেন এই প্রশ্নের জবাবে বলব, সে ছিল স্বভাবে সব চাইতে বেয়াড়া, ভীষণ ক্রোধী। উত্তেজিত হলেই তার কোনো ধর্মাধর্ম, ন্যায়-অন্যায়, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকত না। সে তখন উন্মাদ, বদ্ধ পাগল। অথচ মানুষের সংসারে এমনতর অমানুষের অস্তিত্ব শুধুই অনর্থ ঘটায়। অনর্থের হাত থেকে সংসারকে বাঁচানর জন্যে আমি তাকে খুন করেছি।

দু নম্বরকে?

সে ছিল নিদারুণ লোভী। সব, সমস্ত কিছুই তার চাই। এ সংসারে ভাল যা কিছু, যা কিছু মূল্যবান, যা কিছু সৌভাগ্য-দায়ক সবই তার চাই। না পেলে সে যে কোনো চালাকির, কূটতার, ধূর্ততার, ছলনার আশ্রয় নিত। কোনো বাধাই তাকে নিরস্ত করতে পারত না। তাকে কতবার বলেছি, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। কি লাভ শুধু অনর্থ ঘটিয়ে। সে শুনত না। অনর্থের হাত থেকে সংসারকে বাঁচানর জন্যে আমি তাকে খুন করেছি।

তিন নম্বর?

সে ছিল অন্ধ, অন্ধেরও অধিক, সে ছিল মোহগ্রস্ত। এত মোহগ্রস্ত যে মুদগরেও তার অন্ধত্ব ঘুচত না। কত বিদ্রূপ করেছি, কত ঠাট্টা করেছি তার মূঢ়তা নিয়ে, বলেছি, চিরদিন কিছুই একরকম থাকে না, সে তবু যে সেই। অথচ একালের মানুষের সংসারে এমন মূঢ়ের বেঁচে থাকা নিষ্প্রয়োজন। তার মরা ভাল। তাই অনর্থের হাত থেকে সংসারকে বাঁচানর জন্যে আমি তাকে খুন করেছি।

চার নম্বর?

ভীষণ অহংকারী। এত অহংকার ভগবানেরও অসহ্য। অবশ্য প্রশ্ন করতে পারেন, আমি কি করে জানলাম? অবশ্যই জানি না, তবে অনুমান করতে পারি। এবং অনুমানেই মনে হয়েছে এই অহংকার অনর্থের কারণ হবে। আর তাই অনর্থের হাত থেকে সংসারকে বাঁচানর

জন্যে আমি তাকে খুন করেছি।

পাঁচ নম্বর ?

আমি ক্ষণকাল আমার এই ভাবনাকে থামিয়ে ভাবলাম, এ ধরনের উত্তরে বড়বাবু আদৌ সন্তুষ্ট হবেন কিনা ? নাকি বক্তব্যের দীর্ঘতায় ধৈর্য হারাবেন অথবা অসহিষ্ণু হয়ে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে বলবেন, থামো, এবং হাজতে ফেলে রাখার হুকুম দেবেন। বড়বাবু যাই-ই মনে করুন, আমি ভাবলাম, যখন সত্য বলার দায় মেনেছি তখন অন্যে কি ভাবল তাতে আমার কিছুই যায় আসে না। তাছাড়া আমি তো কারো মনোরঞ্জনের দায় মানছি না, সত্য বলার অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে পালন করছি মাত্র। সুতরাং আমি নির্ভয়।

হ্যাঁ, পাঁচ নম্বর যে, তাকে খুন করেছি যেহেতু সে ছিল পরশ্রীকাতর। কারো সামান্য ভালোতেও সে বিষণ্ণ হত, অসুস্থ বোধ করত। জ্বলত, পুড়ত, দগ্ধাত। তার দুঃখ, সব ভাল তার নয় কেন ? অথচ আশ্চর্য, কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারতাম না যে সংসারের সব-ভাল কিছুতেই একজনের হতে পারে না। সে বুঝত না। তার অবুঝ মন যে কোনো মুহূর্তে অনর্থ ঘটাতে পারত। সেই অনর্থের হাত থেকে সংসারকে বাঁচানর জন্যে আমি তাকে খুন করেছি।

হঠাৎ, আকস্মিক ভাবে মনে পড়ল প্রত্যেকটি খুনের জবাবের অন্তিমে আমি বার বারই একটি কথা বলছি যে 'আমি তাকে খুন করেছি'— অথচ একথা সত্য নয়, যেহেতু, সে আমাকে সাহায্য করেছে। বলাবাহুল্য এখানে একটি কিন্তু আছে। অর্থাৎ আমি যা বলেছি তা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়, অথচ সম্পূর্ণ সত্যও নয়, যেহেতু সে সাহায্য করেছে। তাহলে 'আমি' কেন বলছি ? আমি ভাবনায় পড়লাম। মনে হল এখানেই সচেতন ও অবচেতনের দ্বন্দ্ব। আসলে খুনের ইচ্ছা আমারই ছিল, কৃতিত্বও আমিই নিতে চেয়েছি। যেহেতু ক্ষমতার অভাব, সেহেতু সে-র সাহায্য নিয়েছি। এবং আমার ইচ্ছা ছিল সে-কে, যে অন্য পাঁচজনের মতোই আমারই অস্তিত্বের অংশীদার, অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ, সেই তাকেও

খুন করব। কিন্তু সে চালাক, সে ধূর্ত, সে কূট-কৌশলী, সে ধড়িবাজ, সে পাষণ্ড। প্রাণপণ চেষ্টায়ও আমি তাকে খুন করতে পারি নি। অথচ সে কুৎসিত, সে ভয়ঙ্কর, সে বীভৎস। পাপে, রাহাজানিতে, শয়তানের স্তবে, সে উন্দাম! সে নারকী, ধর্মাধর্মহীন, শালীনতাহীন, গর্হিত-রুচি, সে নির্মম। যদি তাকে খুন করতে পারতাম, ওফ্! যদি পারতাম…।

না, যা ঘটে নি, যা ঘটাতে পারি নি, সে কথা থাক। আমি ভাবছিলাম আর কি প্রশ্ন করতে পারেন? কী?

আমি চতুর্দিকে তাকালাম। অন্ধকার, অন্ধকার। লোহার গরাদে মুখ চেপে তাকাতে চেষ্টা করলাম। দেখলাম, হাজতের সামনের গলি অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ এক জায়গায় থেমে গেছে, এবং সেখানে অনেক দূরে অস্পষ্ট আলোর রেখা। বুঝলাম, এখনো দিন।

কত বেলা হল কে জানে? তবু সেই আশ্চর্য সময় এল না, হাত ধরে আমাকে বাইরে নিয়ে গেল না, বলল না, তুমি দোষী; বলল না, তুমি নির্দোষ।

আমি ভাবছিলাম, সেই আশ্চর্য সময় কখন আসে? কখন? সে কী সমস্ত আশার অন্তিমে? কে জানে! আমি অন্ধকারের চোখে চোখ রেখে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। ভাবতে চেষ্টা করলাম, সে কোথায়? কি করছে? এবং ভাবতে চেষ্টা করলাম, সে কি গায়ে পড়ে কিছু বলেছে? যদি বলে, সে কী বলতে পারে? সে কি সমস্ত দোষ, সমস্ত দায় আমার ঘাড়ে চাপিয়ে অবলীলায় আলোয় হেঁটে বেড়াবে? গন্ধ শুঁকবে ফুলের? চুম্বন করবে ফলে? সে কি সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্যে নিজেকে সরিয়ে নেবে তফাতে? যদি তাই হয়, তাহলে, আমি ভাবলাম, আমি বিস্মিত হব না, আমি চমকে উঠব না। আমি…

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। হঠাৎ তালা খোলার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দাঁড়ালাম, বেরিয়ে এলাম হাজতের বাইরে। সামনে

দাঁড়িয়ে ছিলেন ছোটবাবু, হেসেই বললেন, বড্ড ভুল হয়ে গেছে, আপনি যেতে পারেন।

মানে! আমি মুক্ত?—আমি চীৎকার করে উঠলাম।

ছোটবাবু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন।

থানার মাঠে পা দিতেই সে হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরল।

আমরা হাঁটছি॥

৭

# অলৌকিক অরণ্যে

পুনঃ সেই অন্ধকারে, যা গাঢ় ঘন জটিল, যা অবয়বহীন, অথচ সত্য; যা বিগত রাত্রে ওদের প্রচুর দুঃখ উপঢৌকন দিয়েছে, বিচ্ছেদজনিত যন্ত্রণা, কষ্ট, ক্লান্তি, ওরা ক্রমে সেই অন্ধকারের অন্তর্গত হল। অন্ধকার সম্পর্কিত ভয়-ভাবনাই যদিও ওদের পক্ষে এ মুহূর্তে স্বাভাবিক, কিন্তু ওরা সে সম্পর্কিত ভাবনায় বিব্রত না হয়ে ভাবল সদ্যলব্ধ মুক্তির কথা, যে মুক্তি উভয়েরই। বলাবাহুল্য, এ মুক্তি তাদের স্বস্তি দিয়েছে, সান্ত্বনা। অর্থাৎ এখন ওরা স্বাধীন, মুক্ত, (স্বাধীনতা ও মুক্তি—এই দুই শব্দ ও তার গূঢ়ার্থ ওদের স্বেচ্ছাচারের উদ্দামতার সঙ্গে সমার্থক) এবং এই সুখই ওদের অন্য ভাবনাগুলোকে ঘনিষ্ঠ হতে দিল না। ফল হল এই, যেখানে সোজা পথটা হঠাৎ চার হয়ে গেছে, সেখানে ওদের অখেয়ালের দরুণ, ওদের সদ্যলব্ধ উত্তেজনার দরুণ, ওরা যে পথ ধরল সে পথ পশ্চিমমুখী, আসলে ওদের গন্তব্য দক্ষিণে। ফলে ওরা গভীর অরণ্যের কবলিত হল।

দুপাশে অসংখ্য বৃক্ষ, বনস্পতি, লতাগুল্ম, কঠিন অন্ধকার। পত্র-পল্লবে, শাখা-প্রশাখায় মাথার উপরিস্থিত শূন্য সীমাবদ্ধ, অনেক দূরের আকাশ অথবা নক্ষত্ররাজি দেখা অসম্ভব। যখন ওদের খেয়াল হল তখন বনস্থলী নিবিড়, যদিও নির্জন নয়। যেহেতু হাওয়ার আকস্মিক আঘাতে বৃক্ষশীর্ষে, আশেপাশে, হঠাৎ হঠাৎ ঝড়ো আওয়াজ হচ্ছিল, কখনো বা আরণ্যক পাখী সমূহের পাশ ফেরার মৃদু কলরব, কখনো বা বন্যজন্তু ইত্যাদির আকস্মিক গর্জন।

যেহেতু পথ ও পরিপার্শ্ব সম্পর্কে ওদের অজ্ঞতা মাত্রাধিক, সেহেতু আরণ্যক কোলাহল প্রাথমিক মনোযোগ কাড়তে সক্ষম হলেও, ওদের

ক্লান্ত করতে পারল না। ওরা ভাবল ( সে আগেই পথের বিস্তৃত খোঁজখবর নিয়েছিল ) এই-ই পথ, এবং আরো এগোলেই সেই চৌমাথা অর্থাৎ চার রাস্তা, এই বিশ্বাসে ওরা মনে করল পথিপার্শ্বের কোলাহল স্বাভাবিক। সুতরাং ওরা যথারীতি এগোতে লাগল। ভাবল, আরো কিয়ৎকাল পরেই দক্ষিণের রাস্তা ধরে অবলীলায় ঘাটে পেঁছবে, দেখতে পাবে সম্মুখে মৃদুস্রোতা সেই রমণীয় নদী ( সে তাকে সেই নদীর কথা ইতিমধ্যেই বলেছে ) অন্ধকারেও কিরিচের মতো জ্বলছে, এবং ঘাটে বাঁধা নৌকোর মাঝিরা অসময়ে দূরপথের যাত্রী পেয়ে অপরিমিত সুখে, পুলকে ওদের স্বাগত জানাচ্ছে। যেন ওদের এই আকস্মিক উপস্থিতিই মাঝিদের অশেষ সৌভাগ্য !

বলাবাহুল্য, ওরা ক্রমে, ক্রমান্বয়ে গভীর অরণ্যের অন্তস্তলে এসে দাঁড়াল এবং সবিস্ময়ে উপলব্ধি করল ওরা পুনরায় পথ ভুল করেছে। এ ধরণের মনে হওয়ার কারণ, সেই বড় সড়ক ক্রমে ছোট হতে হতে এখানে এসে অজস্র সরু রেখায় অন্ধকারের ঢালুতে হারিয়ে গেছে। তাই প্রচুর বৃক্ষরাজি ও সংখ্যাহীন লতাগুল্মের ভিড়ে কোনটা পথ অথবা পথ নয়, তা বোঝা, এই সঘন অন্ধকারে প্রাগৈতিহাসিক শিলালিপি বোঝার মতোই কঠিন মনে হল। ফলে ওদের বিব্রত হতে দেরী হল না ! এবং এই অসহায়তার সুযোগে ভয় পুনর্বার ওদের গ্রাস করল। ওদের মনে পড়ল, বিগত রাত্রির দুঃসহ স্মৃতি, অনর্থক আটকে থাকার বিরক্তিকর যন্ত্রণার কথা। এবং সঙ্গে সঙ্গে ওরা যেপথে এসেছিল, সে পথেই হাঁটতে লাগল। দ্রুত, প্রায় দৌড়ে। এবং এই ছুটন্ত অবস্থায় ওরা শুনল, দূরে কোথায় যেন ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ হচ্ছে, ছুটন্ত চাকার ঘরঘর। ওরা যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হল। মনে হল, এ শব্দ স্বাভাবিক নয়, অশরীরী কোনো কিছুর ছলনা, অথবা অলৌকিক, নতুবা ভৌতিক। ক্রমে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ নিকট থেকে নিকটবর্তী হল। ওরা ভয়ে, উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায় যখন মরিয়া হয়ে আর্তনাদের উদ্যোগ করছে, তখনই একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে ওদের পাশে থামল।

ওরা মূক, হতবাক। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে দেখছে আশ্চর্য সুন্দর, স্বাস্থ্যবান দুটো সাদা ঘোড়া, একটি শুচি শুভ্র সাদা গাড়ি, এবং আপাদমস্তক শ্বেত পোশাকে সজ্জিত শুভ্র কেশ, শুভ্র শ্মশ্রু একজন বৃদ্ধ কোচোয়ানকে। ওরা অপলক তাকিয়ে রইল। ওদের মনে হল কোচোয়ানও ওদের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রয়েছে, এবং মৃদু মৃদু হাসছে, যদিও সে হাসি ওদের দৃষ্টিগোচর নয়, তবু ওরা অনুমান করল।

ক্ষণপরেই কোচোয়ান শুধল, কোথায় যাবেন বাবুজী ?

সেই টান, অথচ আশ্চর্য মিষ্টি এবং মোলায়েম কণ্ঠস্বর। ওরা আশ্বস্ত হল। বলল, নদীর ঘাটে।

তাই বলি ! একটু থেমে যোগ করল, যাই বলুন বাবুজী, আমি তো দেখে প্রথমে খুব অবাক মানছিলাম।

পথ ভুল হয়ে গেছে।

ভুল নয় বাবুজী, দোষ পথের। এ পথে এ রকম মনে হয়।

মানে ?

সে অনেক কথা। একটু থামল। সে যাকগে, উঠে বসুন, আমি ঘাটে পেঁছে দিচ্ছি।

সত্যি ?

এ আর এমন কি কথা। সত্যি বলতে কি বাবুজী, এই-ই আমার কাজ।

তুমি কি সে জন্যেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছ ?

আমি ? কোচোয়ান হাসল।

হ্যাঁ তুমি, এত রাত্রে এদিকে কোথায় যাচ্ছিলে ?

বলছি বাবুজী। সবই বলছি। তার আগে গাড়িতে উঠে বসুন, আমি যেতে যেতে বলছি।

অগত্যা ওরা গাড়িতে উঠল। কিন্তু কি আশ্চর্য। কোচোয়ান গাড়ি না ঘুরিয়েই ঘোড়া দুটোর পিঠে পর পর কয়েক ঘা চাবুক লাগাতেই গাড়ি

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। পলকে গাছপালা পেছনে সরে যাচ্ছে, অথচ আশ্চর্য, মাটিতে চাকার কোনো শব্দ হচ্ছে না। মনে হচ্ছে শূন্যের ওপর দিয়ে গাড়ি ভেসে চলেছে।

ওরা উচ্চৈস্বরে ডাকল, কোচোয়ান?

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

এই কোচোয়ান?

কোনো উত্তর এল না।

ওরা ভাবতে চেষ্টা করল ব্যাপার কি? সঙ্গে সঙ্গেই জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে দেখার চেষ্টা করল, কিন্তু প্রবল বাতাসের জন্য ওরা কিছুতেই বাইরে গলা বাড়িয়ে তাকাতে পারল না। মুখ ঢুকিয়ে নিল গাড়ির ভিতরে, ডাকল, এই কোচোয়ান? কোচোয়ান?

প্রত্যাশিত প্রত্যুত্তর বঞ্চিত ওদের তৎক্ষণাৎ মনে হল ওদের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত এতক্ষণের স্বস্তি আর অবশিষ্ট নেই, ওরা বিরাট হাঁ করা এক অন্ধকার গহ্বরের একেবারে মুখে এসে পড়েছে, যেখানে মৃত্যু নামক ভয়াবহ দৈত্য ওদের শেষ প্রহার করবে, এবং ওরা বুঝল ওদের অন্তিম আসন্ন। মৃত্যুভয়জনিত দুর্মর আশঙ্কায় ওদের বুক কাঁপতে লাগল, সারা শরীরে কি এক অজানা ভয় যেন মুহূর্তে স্পর্শের উত্তেজনা দিয়ে চকিতে হারিয়ে গেল। সমূহ সর্বনাশের আশঙ্কায় বিপর্যস্ত হতেই স্বাভাবিকতা হারিয়ে ওরা ছটফট করতে লাগল। ক্রমে ওরা স্বেদাক্ত হল, ক্লান্ত, মরীয়া। ওদের মনে হল, প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শক্তি আর অবশিষ্ট নেই। তবু যে সামান্য জ্ঞান তখনো বর্তমান, যে ক্ষীণ শক্তি বিদ্যমান, সেই জ্ঞান ও শক্তিতে ওরা প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, থা…মো…ও…।

তারপর গাড়ীর মধ্যে ঢলে পড়ল।

শুধু ভয়জনিত প্রতিক্রিয়ার পরিণতি এ নয়, কার্যত ওরা ক্ষুধার্তও। ওরা অচিরেই জ্ঞান হারাল।

যখন জ্ঞান ফিরল, তখন সেই ঘন গভীর অন্ধকার কিছু পরিমাণ অপসৃত। ওরা সেই দিকে অন্ধকারের গর্ভ হতে দেখল আকাশের গায়ে ঝুলে আছে পঞ্চমীর চাঁদ, অসংখ্য নক্ষত্র। ওরা পাশ ফিরল। দৃষ্টির অন্তর্গত অঞ্চলে কোথাও বৃক্ষ অথবা লতাগুল্মের কোনো চিহ্ন নেই। দূরের বিস্তৃত মাঠ চিৎ হয়ে, ওদের মনে হল, ওদের মতোই আকাশের নক্ষত্র গুণে ফিরছে; মাঝে মাঝে চকিত ইশারার শরক্ষেপ করছে চাঁদের দিকে, নক্ষত্রমালার দিকে। বলাবাহুল্য, এই ফাঁকা মাঠের বিস্তৃত পরিসর, চতুর্দিকের এই শূন্যতা ওদের অভাবিত, এবং তাই ওরা বিস্ময়ে উঠে দাঁড়াল। আশ্চর্য। কোথাও সেই অলৌকিক শুভ্র গাড়ি, অথবা পিচ্ছিল পিঠ সাদা ঘোড়াদ্বয়, অথবা সেই শুচি শুভ্র পোশাক পরিহিত প্রসন্নহাসি কোচোয়ানের কোনো চিহ্ন নেই।

শহর ত্যাগের পরবর্তী ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা গোপনে যেহেতু সক্রিয়, যেহেতু ওরা ক্রমে বিশ্বাস করছে ওদের ইচ্ছাই ওদের একমাত্র নিয়ন্ত্রক নয়, অন্য একজন কেউ ওদের ইঙ্গিতে নাচিয়ে চলছে—এমনতর অসরল ভাবনা ওদের পুরুষকারকে নিদারুণ কাবু করে ফেলল; ওদের মনে হল, ওরা যেন অন্তরালবর্তী সেই প্রচণ্ড পুরুষের প্রবল ও প্রগলভ ইচ্ছার খরস্রোতের জলে ভাসমান খড়-কুটো; মনে হল সেই ভাসমান শ্যাওলা, যার আপন ইচ্ছা-অনিচ্ছায় স্থির অথবা অস্থির হবার কোনো যোগ্যতা নেই। এবং এই মনে হওয়া ওদের স্বাধিকারজনিত স্পর্ধাকে, স্পর্ধার অনুভবকে অবশ করল, ফলে অলৌকিক সংঘটনজাত সমস্ত বিস্ময় আর যন্ত্রণাদায়ক মনে হল না, এমন কি ওরা বিব্রত বোধও করল না। ওদের স্পষ্টই মনে হল, মানুষের ইচ্ছাশক্তির চাইতে ভীষণ ও উদ্দাম কোনো শক্তির ইচ্ছাই ওদের ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে।
এ মুহূর্তে যদিও ওরা নাগরিক অভিজ্ঞতায় জানে, এই অলৌকিক শক্তির কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের অর্থ আত্মহত্যা, কিন্তু নিরুপায়, যেহেতু এমতাবস্থায় বিদ্রোহের পরিণতি অমৃত নয়, কঠিন মৃত্যু।

সুতরাং ওরা আত্মশক্তিতে উঠে দাঁড়িয়েও ক্ষণকাল ভাবল, যেহেতু অন্তর্মনে দ্বন্দ্ব সক্রিয়; অপেক্ষা করল, যেহেতু স্বশক্তিতে বিশ্বাস আর ওদের অটুট নয়। কিন্তু এ মুহূর্তে কোনো অলৌকিক অঘটন ঘটল না। অনেকক্ষণ পরেও না। তাই ওরা আদ্যোপান্ত ভাবতে চেষ্টা করল, বুঝতে চেষ্টা করল বিগত সমস্ত সংঘটনের তাৎপর্য।

অন্ধকারে অকস্মাৎ আলো জ্বলে উঠলে যে বিস্ময়ের উচ্চারণ হয়, মুহূর্তে ওদের মনোলোকে তেমনই এক সত্য অবয়ব নিল। ওদের অকস্মাৎ মনে হল, ওরা আদৌ কোনো ঘটনার নায়ক হয় নি বা ছিল না। আসলে সেই পরিত্যক্ত স্টেশনের অদূরবর্তী সেই দৈত্যের মতো দেয়ালগুলোর কাছ থেকে পালিয়ে ওরা এই দীর্ঘক্ষণ মাঠের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে ছিল। এবং ওদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে পূর্ববর্ণিত ঘটনাসমূহ সত্যিই সংঘটিত হয় নি, ওদের মনে হল, সমস্তই হয়ত দুঃস্বপ্নের অন্তর্গত বিকার ইত্যাদি।

প্রেক্ষিত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ওদের মানসিকতার ভঙ্গি-বদল হল। ওরা হাসল, তাকাল ঘুরে ফিরে, চতুর্দিকে। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় ওরা দেখল বিস্তীর্ণ মাঠ, এবং অদূরে অতি উজ্জ্বল একটি রুপোলী রেখা।

ওখানে কি নদী আছে? সেই নদী? যেখানে ঘাটে মাঝি আছে, দূর-যাত্রার নৌকাও?

তাহলে?

ওরা পরস্পর পরস্পরের দিকে পুনরায় বিস্ময় নিয়ে তাকাল। ওদের মনে হল, ওদের পুনর্বার প্রেক্ষিত পরিবর্তন হচ্ছে, ভঙ্গি বদল হচ্ছে মানসিকতার। মনে হচ্ছে, বিশ্বাসের ভূমিও স্থির নয়, স্থায়ী নয়। ওরা, ওরা ওদিকেই, ওই রুপোলী রেখার দিকেই, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল।

নদী। নদী! ওরা সেই রমণীয় নদীর দিকে গেল।।

## ৮
## ডাকাতে নদী

অদূরেই ওরা নদীর দেখা পেল।

নাতি-বিস্তৃত নদী, ওপার ঢালু, এপার খাড়াই। ওরা ক্রমে খাড়াইয়ের সীমায় এসে দাঁড়াল।

যতদূর চোখ যায় কোথাও তরুশ্রেণীর চিহ্ন নেই, জলরেখা কোথাও মৃদু বেঁকে অনেক দূরের দিকে চলে গেছে। ওরা জলের দিকে তাকাল। বারম্বার তাকিয়েও ওরা বুঝল না নদী একস্রোতা, না স্থিরস্রোতা। কিন্তু মনে হল, জল গভীর, জলের ছোট ছোট ঢেউ মাছের মতো এলোমেলো ভাসছে, চন্দ্রালোকে মাঝে মাঝে ঝিকমিক করে উঠছে। ওরা ঘাটের খোঁজ করতে লাগল।

যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূরে, ওরা কোনো ঘাট দেখতে পেল না যেখানে শান বাঁধান আছে, অথবা তক্তা বসান অস্থায়ী ঘাট, অথবা ঘাটের মতো কিছু। শুধু কোথাও কোথাও খাড়াই থেকে হঠাৎ নেমে যাওয়া কিছু মেঠো ঘাটের দেখা পেল, কিন্তু সে সমস্ত অস্থায়ী ঘাটে কোনো নৌকা বাঁধা ছিল না।

ওরা এগোতে লাগল। ক্রমে একটি বিশাল বাঁকের কাছাকাছি।

ঢেউয়ের শব্দের চেয়েও তীব্র একটি শব্দে চমকে উঠল। দেখল অদূরে, বাঁকের কোলে একটা নৌকা ঢেউয়ের আঘাতে মাঝে মাঝে শব্দ তুলে দুলছে। ওরা ডাকল, মাঝি।

আশ্চর্য! প্রথম ডাকেই মাঝির সাড়া পাওয়া গেল। গলা বাড়িয়ে শুধল, কোথায় যাবেন বাবু?

পীরের ঘাটে, সত্যপীরের।

মাঝি ত্বরিতে গলা ছইয়ের নীচে টেনে নিল। কিছুক্ষণ আশ্চর্য নীরবতা। হঠাৎ নৌকার মধ্যে কথা কাটাকাটির শব্দ শোনা গেল। একটু পরে পুনর্বার গলা বাড়িয়ে বলল, উঠে আসুন।

কত ভাড়া নেবে ?

সে একটা ধরে দেয়েন 'খন।

ওরা বুঝল মাঝিরা কুটিল নয়, সরল। ওরা উঠে বসল। মাঝিরা দুজন।

মুহূর্ত পরেই নৌকো ছেড়ে দিল।

ওরা যেন নিজেদের ভবিষ্যতকে অন্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছে এমনি অলস, অবসন্ন ভঙ্গিতে ছইয়ের নীচে ঢুকে পাটাতনের এলোমেলোয় গা এলিয়ে দিতেই গভীর ঘুমে ঢুলে পড়ল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল, অথবা আদৌ ঘুমিয়েছিল কিনা ওদের খেয়াল নেই, হঠাৎ ছইয়ের ওপরে কথা কাটাকাটির অস্পষ্ট মৃদু শব্দে ওরা উঠে বসল। অগাধ কুয়াশায় সমস্ত সাদা, ঝাপসা। ওরা যদিও বুঝল, ভোর হচ্ছে, কিন্তু বিস্মিত হল নদীর ক্ষীণতা দেখে। সেই বড় রমণীয় নদী এ নয়, কুয়াশার পুরু চাদরের তলা থেকেও আবছা দেখা যাচ্ছে দুই পাড়। ওরা অনুমান করতে চেষ্টা করল, কোথায় এসেছে ; এবং ডাকল, মাঝি।

ইতিমধ্যে মাঝিদের কিছু বিচ্ছিন্ন কথা ওদের কানে এসেছে, কিন্তু গুটিকয় এলোমেলো শব্দ ছাড়া ওরা আর কিছুই বোঝে নি। এবং এলোমেলো সেই শব্দগুলোকে পরস্পরের গা ঘেঁষে দাঁড় করাতেই ওরা হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল। মনে হল, এই শব্দসমূহের সম্মিলিত অস্তিত্বে এক অবাঞ্ছিত রহস্যের এবং রোমাঞ্চের গন্ধ আছে। ওরা মনে মনে সতর্ক হল, এবং পুনর্বার ডাকল, মাঝি।

বলুন বাবু।

এ কোথায় এসেছি।

আজ্ঞে, এ হচ্ছে কাটা খাল। স্থানের নাম আজ্ঞে গলাভাঙা।

এখানে কেন?

আজ্ঞে, পথটা সোজা। তাছাড়া ধরুন—

কি?

মাঝি অতিমাত্রায় বিনীত এবং সংকুচিত হয়ে বলল—যদি দোষ না নেন তো বলি।

বল।

আজ্ঞে বড় নদী দিয়ে গেলে খাল পুলিশের ট্যাক্সোর বড় বায়নাক্কা। তা ছাড়া আজ্ঞে আমাদের লাইসেন্সো নেই। তাই বুঝলেন না আজ্ঞে কাটা খাল দিয়ে এইচি।

এদিকে বুঝি ট্যাক্স দিতে হয় না।

না আজ্ঞে, এ হল কিনা চোরাই খাল।

হুঁ, তা নৌকো থেমে কেন।

ওই যে আজ্ঞে ভাঁটি পড়ে গেছে। প্রায় কাঁচুমাচু হয়ে বলল, বড্ড ভুল হয়ে গিয়েচে।

নৌকা ছাড়বে কখন?

আজ্ঞে জোয়ার না এলো তো···

কখন আসবে?

সে পহর বেলায়।

অতক্ষণ এখানে?

বড্ড ভুল হয়ে গেচে বাবু।

মাঝি বেলা পরখ করতে গলুয়ের দিকে দুপা এগিয়ে গেল।

যেহেতু নিরুপায়, সেহেতু অপেক্ষাই শ্রেয়। কিন্তু মনে মনে ওরা ভীষণ ক্ষুব্ধ হল, ক্রুদ্ধও। অথচ উপায়হীন। এবং ওরা ভাবল, যদিও এ অঞ্চল শহর থেকে অনেক অনেক দূরে, তবু এখানের গ্রাম্য মানুষগুলো, এই মাঝিরা, আদৌ সহজ অথবা সরল নয়। এরাও সেই আশ্চর্য পথটা চিনে ফেলেছে, সেই ফাঁকির মসৃণ পথটা। ভেবে ওরা বিমর্ষ হল।

ওদের মনে পড়ল এ-কালের রাজধানী সেই কলঙ্কময়, কোলাহলমুখর শহরের কথা, যেখানে জীবন উদ্দাম নদীর মতো, কিন্তু সেখানের মানুষগুলো সে নদীতে গা ভাসিয়ে স্থির নয়, আদৌ নয়। বরং সবাই সেই খরস্রোতের মধ্যধারায় পাড়ি না জমিয়ে অনন্তর তীরের সহায় খোঁজে; এবং লাফিয়ে মোহানায় পৌঁছনোর স্বস্তি চায়। কিন্তু সিদ্ধির পথ, মোক্ষের পথ যেহেতু কঠিন, ক্রূর, নির্মম; যেহেতু সর্বাঙ্গীন সফলতার জন্য তপস্যার অমানুষিক পরিশ্রম বাধ্যতামূলক, অথচ শহুরেদের ধারণা, জীবন ক্ষণস্থায়ী, ফলে ওদের বিশ্বাস মোক্ষের পথ সদর নয়, অন্দর; সড়ক নয়, চোরাগলি। এবং সঙ্গত কারণেই ওদের মনে হল, এরাও, ওই মাঝিরাও সেই মানুষ; এরাও একই ইচ্ছা ও ও বিশ্বাসে দূষিত; মনে হল, এরাও এই কালের হাতে মর্মান্তিকভাবে ধরা দিয়ে দিয়েছে।

ক্রমে কুয়াশা গলছে। এখানে ওখানে শিশিরের ভেজা পায়ের ছাপ। ক্রমে বেলা বাড়ছে, রোদ্দুরও। ক্রমে জোয়ারের জল ঢুকল খালে, নৌকা আবার ভাসল। মাঝিরা লগি ঠেলে ঝোপঝাড়ের গা বাঁচিয়ে, ঝুঁকে-পড়া গাছের ঝুলে-পড়া ডাল বাঁচিয়ে নৌকা এগিয়ে নিতে লাগল।
খালটা চোরাই বলে পথটা খুবই জটিল। নিতান্তই অপরিচ্ছন্ন। এবং অপরিচ্ছন্ন বলেই সময় লাগল অনেক অনেক বেশি। যেখানে ওদের ভোরের আলোয় পৌঁছনোর কথা, সেই পীরের ঘাটে নয়, তারও অনেক এদিকের গঞ্জের ঘাটে পৌঁছল ভর দুপুরে। যদিও নামে গঞ্জের ঘাট, আসলে এখানে গঞ্জের কোনো চিহ্ন নেই, অথবা কোনো জন-মানুষের আনাগোনা। এখানে এসেই মাঝিরা হঠাৎ বলল, এখানেই নামতে হবে আজ্ঞে।

কেন? এ তো পীরের ঘাট নয়।

তা নয়।

তাহলে এখানে নামব কেন?

নৌকো আর উজানে যাবে না।

যাবে না মানে!

আবার ভাটি পড়চে কি না! আরো এগোলে এবেলা এখানে কাটাতি হবে। সে বাবু হবে নি।

তা বলে এই অস্থানে—

আজ্ঞে উপায় থাকলে—

কিন্তু—

ওরা বোঝাতে চাইল যে এমনি আঘাটায় নামিয়ে দিলে ওরা পথ ভুল করবে। তাছাড়া নতুন আগন্তুক।

মাঝিরা এ সমস্ত কথার ধার দিয়েও গেল না। ওদের সেই এককথা, এখানেই নামতে হবে।

ব্যাপার ক্রমে গুরুতর আকার ধারণ করল। মাঝিরা ক্রমে উত্তেজিত হয়ে উঠল, অসহিষ্ণু, প্রায় অস্বাভাবিক এবং এক সময় ওদের সম্বল কেড়ে নিয়ে মাঝিরা ধাক্কা দিয়ে কাদায় নামিয়ে দিল। ওরা যখন রুখে উঠতে গেল, মাঝিরা লগি তুলে শাসিয়ে বলল, আর একটি কদম বাড়িয়েছ কি জ্যান্ত কাদায় পুঁতব। তার চেয়ে ভালমানুষের পো, নাক বরাবর সোজা চলে যাও, পীরের ঘাট পেয়ে যাবে।

ওরা ক্ষুব্ধ এবং অপমানিত। বলল, এ অন্যায়।

কি! অন্যায়!—মাঝিরা বিকট শব্দে হেসে উঠল। উচ্চ, অট্টহাসি। সেই হাসির উচ্চারণে ওরা হতভম্ব হয়ে গেল। বুঝতে পারল না কি এমন গর্হিত কথা বলে ফেলেছে। ওরা অবাক চোখে মাঝিদের দিকে তাকিয়ে রইল। মাঝিরা হাসতে হাসতে একে অন্যের গায়ে ঢলে পড়তে পড়তে বলল, শালার শহুরে বাবুরা ন্যায় অন্যায় বোঝাচ্ছে রে! যেন কত বোঝদার।

ওরা বিস্মিত, বিমূঢ়।

মাঝিরা নৌকা ছেড়ে দিল ॥

৯

## মধ্যাহ্নে আঁধার

রৌদ্র ক্রমে খর ও দুঃসহ হয়ে উঠছে। ওরা দ্রুত পা চালাল। আকাশটা যেন মাথা ছুঁই ছুঁই ছাদ, আর সূর্যটা যেন সেই ছাদ থেকে ঝোলান লক্ষ আলোর ঝাড়, ওদের মুখের উপর, চোখের উপর অসহ উত্তাপে জ্বলছে, এবং ক্রমে সে তাপ মাত্রাতিরিক্ত বাড়ছে। আগেই স্বেদসিক্ত হয়ে গিয়েছিল, এখন তৃষ্ণায় প্রাণ যায় যায়। ক্রমে ওদের চলা ধীর হল, মনে হল, এভাবে আর বেশিদূর এগোতে পারবে না, অথচ সে ঘাট যে কত দূরে ওরা জানে না। ওদের মনে হল, সে অনেক, অনেক দূর। ইতিমধ্যে একবার কপালে হাত রেখে দূরের পরিমাপ করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু রোদ্দুরের তেজ এত প্রবল ও প্রচণ্ড যে, সামনের সবটুকুই ওদের মনে হল জলা। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর চিকচিক করছে জল, কাঁপছে। বিসারিত দেহ এই ধু ধু মাঠের কোনো সীমান্তই ওদের নজরে এল না। যেহেতু নাক বরাবর চলার নির্দেশ দিয়েছে, যদিও মাঝিরা বিশ্বাসঘাতক, অমানুষ, তবু আগন্তুকের কাছে, নবাগতের পক্ষে, অন্ধের এমন কি দিগভ্রষ্টের নির্দেশও অগ্রাহ্য নয়, এমন বিশ্বাসে মরিয়া হয়ে ওরা চলতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য রকমের ধীর, পথ অফুরান। ওরা ভাবল হয়ত দিক-চিহ্নহীন মাঠেই তাদের মৃত্যু হবে, হয়ত এইই তাদের কঠিন নিয়তি এবং কোথাও ছায়ার কোনো চিহ্ন নেই, এ যেন মধ্য সমুদ্রে দিগভ্রান্ত নাবিকের দিগভ্রষ্টতাজনিত বিপর্যয়। ওরা চতুর্দিকে চোখের আলো ফেলল। আশ্চর্য! কোথাও কিছু নেই, শুধু চারিদিক জুড়ে অথৈ থৈ জল

কাঁপছে। দূরে চিকচিক ঝিকমিক করছে জল আর জল। ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। এবং আরো তন্ন তন্ন করে চতুর্দিক দেখতে গিয়ে ওরা ভুলে গেল ওরা কোন দিক থেকে আসছে, এবং কোন দিকে যাচ্ছিল। যে দিকেই তাকাচ্ছে ওদের মনে হচ্ছে ওরা ওদিকেই যাচ্ছে। ওরা আকস্মিক উদ্‌ভ্রান্ততায় নিরতিশয় বিমূঢ় হয়ে গেল। অবাক, হতবাক। এবং মুহূর্তেই ওরা সুতীব্র উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায়, ভয়ে এবং পরিবেশের বীভৎসতায় দিগন্ত বধির করা আর্ত চীৎকারে ফেটে পড়ল।

অথচ ওরা একটা রমণীয় নদী দিয়ে, চোরাই খাল দিয়ে গঞ্জের ঘাটে এসেছিল। এবং সেই খাল, সেই গঞ্জের পোড়ো পোড়ো ছাউনি, সেই খালের রেখা পেছনে ছিল, ওদের পেছনে। কিন্তু এ মুহূর্তে সেই খাল, সেই গঞ্জ কোথাও নেই। চতুর্দিকে মায়া-জলের মরীচিকা। ওদের মনে হল ওরা আকাশের নীচে আকাশের মতো বিশাল এক দীঘির জলে দাঁড়িয়ে। কূলহীন কিনারাহীন এই অসহ অবস্থায় ওরা ক্রমে নিস্তেজ, নিরুদ্যম হতে হতে অবশ, অনড় হয়ে গেল। মনে হল কে যেন পা জড়িয়ে ধরেছে ওদের, কে যেন ওদের টেনে নামাতে চাইছে নীচে, মাটিতে। ওরা মাটিতে বসে পড়ল। মাটিতে কোথাও ঘাসের কোনো চিহ্ন ছিল না, উত্তপ্ত কাঁকুরে মাটি। অনন্যোপায় ওরা ঢলে পড়ল মাটির উপর।

মাটির, মাঠের উপরের অসহ উত্তাপে ওদের শরীর জ্বলছিল, পুড়ছিল। মনে হচ্ছিল ওরা তখন দাউ দাউ আগুনের উপরের তাতানো কড়ায়ের ওপর শুয়ে আছে। চামড়া পুড়ছে, চুল, মুখ, সর্বাঙ্গ। ওদের পালাবার ইচ্ছা, ছোটার ইচ্ছা ক্রমে ক্রমে হারিয়ে গেল। ওরা দাঁতে দাঁত চেপে অনিবার্য মৃত্যুর প্রতীক্ষায় শরীর এলিয়ে চোখ বুজে পড়ে রইল।

অন্ধকার। চতুর্দিকে অন্ধকার। ওরা ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে সচেতনতার অতীত এক কাঠিন নির্বোধ অন্ধকারের গভীরে। ওদের মনে হল, অন্ধকারের গভীরে অজস্র সরু, অতি সরু রেখায় গড়া বৃত্ত, প্রতিটি বৃত্তের পরিধির মধ্যে আরো সংখ্যাহীন বৃত্ত, এবং বৃত্তগুলো

পরস্পর পরস্পরের পাশ দিয়ে ক্রমে আবর্তন করে করে ফিরছে, কখনো বা পলকের জন্য মিলিয়ে গিয়ে আবার ভেসে উঠছে। ওদের মনে হল, বৃত্তগুলো পরস্পর জড়িয়ে জড়িয়ে নাচছে, খেলছে, ইতস্তত ; এবং আরও মনে হল, ওরা ক্রমে ক্রমশঃ নেমে যাচ্ছে নীচে আরও নীচে, অন্তহীন এক গভীরতায়, দ্রুত, অতিদ্রুত। কিন্তু আশ্চর্য ! কোথাও থামছে না, বাধা আসছে না কোনো, এবং সেই আশ্চর্য বৃত্তগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে অবলীলায়, সুমুখে চতুর্দিকে।

ওরা স্পষ্টই বুঝল এই অন্ধকার, ওই সংখ্যাহীন বৃত্ত, আর ক্রমান্বয় অধঃপতন, আর কিছু নয়, মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু।

মৃত্যু ?

যে অনির্বাণ উত্তাপ জীবনকে ধারণ করে, লালন করে, যে দুর্বার উত্তাপের স্পর্শে জীবন দাউ দাউ শিখার উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত হয়, জ্বলে, দুর্মর বেগে উদ্দাম হয়ে ছোটে, পুষ্পে পল্লবে ফলে অসীম হয়ে ওঠে, ওরা বুঝল, ক্রমে সেই মহৎ উত্তাপের সঞ্চয় হারিয়ে এক বীভৎস শূন্যতার নির্মম হাতের পুতুল হয়ে উঠছে। এই ভাবনা, এই বোধ, নিরস্তিত্ব হবার সর্বগ্রাসী ভয়, মুহূর্তে ওদের নিস্তেজ, নিঃসাড় শরীরে আগুন দিয়ে বারুদের কাজ করল। পলক পাতে ওরা সুদীর্ঘ আর্তনাদে শূন্যতাকে বিদীর্ণ করে, অন্ধকারকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে চোখ মেলল।

আশ্চর্য ! কোথাও সেই খাণ্ডবদাহী রৌদ্রের খর অস্তিত্ব নেই, দাউ দাউ শিখার উত্তাপ। ওরা স্পষ্টই দেখল, ওরা প্রায় মাঠের সীমান্তে দাঁড়িয়ে। দূরে দীঘল দেহ এক বনস্পতি বিশাল বাহুর নীচে রাশি রাশি ছায়ার আমন্ত্রণ নিয়ে স্থির, অকম্প। ওরা পুনর্বার বিস্ময়ে বিমূঢ় হল। এবং সর্বদেহে মনে উচ্চারিত অনির্বচনীয় এই অলৌকিক অনুভবের শিয়রে দাঁড়িয়ে ভাবতে চেষ্টা করল, সত্য কি ? ওই সর্বগ্রাসী লোহি লোহি রোদ্দুর, না, এই প্রসারিত বাহুর ছায়াময় অস্তিত্ব ? ওরা আদ্যোপান্ত অঘটনকেই অলৌকিক এক রহস্যের অন্তর্গত সংঘটন মনে করে আপাতঃ

স্বস্তিতে পা বাড়াল, যেখানে স্থির বনস্পতি আকাশকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে।

ওরা পায়ে পায়ে এগোতে লাগল। দেখল, বনস্পতির অদূরে একটি ঘাট। এদিকে, বৃক্ষের ছায়া ডিঙিয়ে একটি চওড়া সড়ক দূরের দিকে চলে গেছে। ওরা অনুমানে বুঝল, এই সেই পীরের ঘাট, আর ওই সেই রাস্তা যা দিয়ে দরগায় যাওয়া যায়। এবং ওরা ভাবল, ওরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবে এই বৃক্ষতলে, সান্ত্বনা কুড়িয়ে নেবে ছায়ার। তারপর বেলা আরো গড়িয়ে গেলে, যখন রোদ্দুরের তেজ একটুও অবশিষ্ট থাকবে না, যখন বিকেলের হাওয়া উদলা গায়ে হেঁটে বেড়াবে মাঠে মাটিতে শূন্যে, যখন বৃক্ষশীর্ষগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে ভাঙা বেলার নিস্তেজ হলুদ রোদ্দুরে, যখন বিহঙ্গের কলগানে মুখরিত হবে বৃক্ষশাখা, চতুর্দিক এবং রাখালেরা গরু ছোটাবে মাঠের মধ্য দিয়ে, গোক্ষুরে ধুলো উড়বে, ঝাপসা হয়ে আসবে দূরের সবুজ, ওরা তখন পুনর্বার যাত্রা করবে।

এমনতর মসৃণ স্বস্তিকে আলতো হাতে নাড়াচাড়া করতে করতে ওরা যখন বনস্পতির অন্তরঙ্গ, তখন দেখল, একটি লোলচর্ম বৃদ্ধ, যাঁর মুখময় দাড়ি, যাঁর মস্তক কেশবিরল, হঠাৎ ওদের দেখে নিরক্ত, পাংশু হয়ে গেলেন। এবং ওদের দিকে স্থির একজোড়া চোখ রেখে পাশে রাখা ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন।

বৃদ্ধের এই অতিমাত্রায় অস্বাভাবিক ব্যবহারে ওরা বিব্রত হল, ভয় পেল, ভাবল, কি এর গূঢ়ার্থ ?

ওদের ভাবনার মুখ খুলতে না খুলতেই বৃদ্ধ স্থির চক্ষু রেখে, জড়ানো গলায় বললেন, এ অঞ্চলে দু-দুটো খুন হয়ে গেছে। পুলিশ খুনীদের খুঁজছে। বলেই মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা না করে ত্বরিতে পা বাড়ালেন, যেন পালাচ্ছেন। যেন এরাই সেই খুনী। (খুনীই তো।) বৃদ্ধ একবারও পেছন ফিরলেন না।

ওরা যেন এই নির্মম উচ্চারণে বজ্রাহত। স্থির, অনড়॥

১০

## অপরাহ্নের রোদ্দুর

যে মানসিক স্থিরতা বিশ্রামের অবকাশ উপঢৌকন দেয়, শ্রান্তি লাঘবজনিত শান্তি, বলা বাহুল্য, বৃদ্ধের আকস্মিক উক্তি স্থিরতার সেই নির্মীয়মাণ সৌধটিকে মুহূর্তে ধ্বসিয়ে দিল। ফলে বিশ্রাম-জনিত সুখভোগের সৌভাগ্য ওদের আর হল না। ওরা সম্মুখের পথ ধরে দ্রুত হাঁটতে লাগল। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত, তবু ওদের হাঁটা ছাড়া গত্যন্তর নেই, যেহেতু পূর্ব পূর্ব অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ওরা আর আকাংক্ষা করে না।

যদিও ওরা নির্দোষ, ওদের বিশ্বাস, তবুও ওদের মনে হল ওরাই খুনী, আসামী। এমনতর মনে হওয়ার পেছনে প্রাক্তন অভিজ্ঞতাসমূহের যে স্পষ্ট হাত আছে ওরা সহজেই বুঝল, এবং এও বুঝল, পাপবোধের জন্ম কখনো তাৎক্ষণিক নয়, তার নিশ্চিত ইতিহাস থাকে, আছেও। এবং সে ইতিহাস আদৌ ধারাবাহিক নয়, এবং সচেতনতার হাত ধরাও নয়। সুতরাং কোনো দূর অথবা নিকট অতীতে সংঘটিত ঘটনার পরিণাম-জনিত ভয়ে, উদ্বেগে ওরা ভাবল, আরো দ্রুত চলাই উচিত, নচেৎ ওরা অবলীলায় কারো হস্তধৃত আমলকী হয়ে যেতে পারে, অকারণে, সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে। এই ভাবনা থেকেই ওরা দ্রুত হাঁটতে মনস্থ করল, কিন্তু প্রবল প্রচন্ড তৃষ্ণায়, বহুক্ষণ ধরে সক্রিয় বিরক্তিকর ক্ষুধায়, স্বেদে, শ্রান্তিতে পা তুলে পা রাখাই ওদের মনে হল অসম্ভব ; দাঁড়িয়ে থাকা অথবা বসা আদৌ নিরাপদ নয়। ওরা পা বাড়াল, এবং এক ফোঁটা জলের জন্যে আশেপাশে চতুর্দিকে তাকাল, কিন্তু কোথাও

কোনো সহৃদয় জলচিহ্ন দেখতে পেল না। ওদের মনে হল, 'এখানে জল নেই, শুধুই শিলা'; এবং অনুভব করল মেঠো রাস্তার তপ্ত ধুলোরাশির মধ্যে ওদের পায়ের পাতা, পা, ক্রমে ডুবে যাচ্ছে। তবু ওরা অতি কষ্টে পা তুলে, পা ফেলে এগোতে লাগল, বড় ধীর, শামুকের মতো, অতিশয় শ্লথ গতিতে। কতক্ষণ এভাবে চলেছে জানে না, এক সময়ে ওরা দেখল একটা মেয়ে পার্শ্ববর্তী মাঠে ছুটে ছুটে গোবর কুড়োচ্ছে। ওরা খুবই বিস্মিত হল, কারণ ওরা এতক্ষণের পথে কোথাও একটাও গরু দেখে নি, অথচ এত গোবর কোত্থেকে এল?

ওরা মেয়েটিকে ডাকল। মেয়েটি, যার একটি চোখ নেই, যার উপরোষ্ঠ কাটা, ফাঁকে যার মাড়িসুদ্ধ দাঁত বেরিয়ে এসেছে, যেন এক্ষুণি কামড়ে দেবে; অধর আশ্চর্য ঝোলা, এবং মাথায় টাক, সেই মেয়েটি, ওদের দিকে অপলক তাকাল। আরো নিকটতর হতেই ভয়ে বীভৎসতায় ওরা চোখ বুজে শুধল, এখানে জল আছে?

ওরা চোখ মেলল। মেয়েটি চমকে ওদের চোখে চোখ রাখতেই চোখটি হঠাৎ অস্বাভাবিক জ্বলে উঠল, এবং মেয়েটি বিকৃত শব্দে চেঁচিয়ে উঠল, খুনী! খুনী! বলেই মেয়েটি ত্বরিতে গোবরের ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে পড়ি মরি ছুটতে লাগল মাঠের উপর দিয়ে। মেয়েটার অদ্ভুত ছোটা দেখে ওদের মনে হল, মেয়েটা খুন হতে পারে এমনি সংক্রামক ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে, এবং ভাবল, এমন একটি মূর্তিমান বীভৎসতাকে কোনো দুর্দান্ত খুনীও কি খুন করতে পারে? বরং ওদের দৃঢ় বিশ্বাস, তার আগে খুনীই হয়ত খুন হয়ে যাবে। অথচ মেয়েটার কী প্রবল প্রচণ্ড ধারণা! ওরা অতি কষ্টে হাসল। ভাবল, আসলে জীবন নামক এই অতি রহস্যময় প্রবাহ, জীবিত ব্যক্তি মাত্রের কাছেই মূল্যবান, অমূল্য। অন্যের তুচ্ছতাতে তার কিছুই যায় আসে না। তবুও মানুষ আত্মহত্যায় রাজী হয়, আত্মহননে উন্মুখ, যেহেতু জীবনের অন্য সহস্র অনুভবের মতো মৃত্যুর স্বাদও সচেতনভাবে অনুভব করার ইচ্ছা মানুষের স্বভাবের অন্তর্গত—এ সেই অজ্ঞাত অপার বিস্ময় যা মানুষের

রক্তের মধ্যে, বুদ্ধি বোধ ও চেতনার মধ্যে, তার অস্তিত্বের অণু-পরমাণুতে অনর্গল খেলা করে। কেন খেলা করে, কেন ?—এই অতি জটিল, অতি কুটিল ভাবনা-গ্রন্থির আবহমান কালের পাকান জট খুলতে গিয়ে ওরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং চলা ভুলে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এক সময় দেখল, দূরের পাথুরে টিলাগুলি ক্রমে পাহাড়ে পরিণত হচ্ছে, পাহাড় ক্রমে বিশাল পর্বত। এবং পর্বতগুলো কখন হেলান রোদ্দুরে পা রেখে হাঁটতে হাঁটতে ছুটতে শুরু করেছে, এবং আশ্চর্য এই, ওরা মনে মনে সেই হলুদ রোদ্দুর হয়ে পলকে পর্বতের চূড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। পরস্পর বিরোধী সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবনা ওরা কি করে ভাবতে পারল —এই বিস্ময়, ওদের অনেকক্ষণ বোবা করে রাখল। ক্রমে ওরা স্বাভাবিকে ফিরে এল, এবং তক্ষুণিই ওদের মনে হল, আরো স্থির থাকলে হয়ত প্রেক্ষিতের আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে, হয়ত ওরা বিরক্তিকর জটিলতায় পড়বে। তা ছাড়া সময় সংক্ষিপ্ত, হয়ত কিছুক্ষণ পরেই সূর্য অস্ত যাবে এবং অন্ধকার ওদের ক্লান্ত করবে, বিব্রত। হয়ত কামড়াবে, নতুবা খুন।

ওরা যখন সত্যপীরের দরগার কাছাকাছি পেঁছিল তখন সন্ধ্যা। পাহাড়ের উপর পীরের দরগায় তখন সার সার প্রদীপ জ্বলছে। ওরা সেই প্রদীপের আলোর দর্পণে নিজের নিজের মুখ দেখার দুরন্ত ইচ্ছায় মরিয়া হয়ে হাঁটতে লাগল ।।

## ১১
## ভয়ের দর্পণে

যা বিরল, যা দুর্লভ, যা অভাবিত, তেমনতর কোনো চরম ও পরম প্রাপ্তির মুখোমুখী দাঁড়ালে মানুষের অস্তিত্বের অণু-পরমাণুতে যে ধরনের কম্পন শুরু হয়, মনে হয় হৃদয়ের স্পন্দন বুঝিবা এই ক্ষণে থেমে যাবে, বুঝিবা দৃষ্টি সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে নিঃস্ব হবে পলকে ; মনে হয়, এই বুঝি অসতর্কতায় হাত ছাড়া হয়ে গেল সব সুখ, সমস্ত সৌভাগ্য,—তেমনতর প্রাপ্তির মুখোমুখী দাঁড়িয়ে ওদের দেহ-মন দ্রুত স্পন্দিত হল, স্বেদাক্ত হল ; মনে হল, দৃষ্টি ক্রমে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে, চোখের সম্মুখের পৃথিবী আকাশ ঘুরছে, পা টলছে। মনে হল, ওদের অস্তিত্বের ভারসাম্য বিপর্যস্ত, ওরা কেন্দ্রচ্যুত এক গ্রহ যে আবর্তন ভুলে অধঃপতনে অস্থির, এক অস্বভাবী কোলাহলে, কলরবে, সর্বোপরি এক অভাবিত বিস্ফোরণে। ওরা পলকে দুহাতে চোখ ঢাকল, মুখে বিড় বিড় করে বলল, না, না।

কী না ? কেন না ? এ অনিচ্ছা কেন ? কিসের ? কার মুখোমুখী হতে ওদের এই দ্বিধা ? অপরিমিত ভয় ? সে কে ? যদি এত অনিচ্ছা দ্বিধা ভয়, তবে ওরা এতদূরে ছুটে এল কেন, কিসের প্রত্যাশায় ? কে ওদের ঠেলে দিল এই অলৌকিক যাত্রায়, এই দুর্গম অভিসারে ? কে ? সময় ! জীবন ! ওরা মনে করতে চেষ্টা করল।

চতুর্দিকের স্মৃতির হাতে হাত রাখতেই, স্মৃতির মুখে মন রাখতেই,

মনে পড়ল এক দুরারোগ্য অসুখে ভুগছিল ওরা, এক অস্বাভাবিক ব্যাধিতে, যার উপসর্গ—অসহনীয় দুঃখ, বিরক্তিকর যন্ত্রণা, বিশ্বগ্রাসী বিষাদ। ওরা সর্বান্তকরণে মুক্তি চেয়েছিল, অগাধ অবাধ মুক্তি; জনপদের সেই ক্লেদাক্ত কোলাহল থেকে; পংকিল কলংক থেকে; ওরা চেয়েছিল, প্রার্থনা করেছিল। এবং ওরা জেনেছিল, ওদের বলেছিল, সে মুক্তি আছে, এখানেই। এখানে কোথায় সে কথা কেউ ওদের বলে নি। যখন ওরা বিষণ্ণ ব্যথিত, তখন ওদের ব্যর্থ, ক্লান্ত অবসন্ন অতিপ্রাজ্ঞ পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহদের আত্মা বলেছিলেন, খুঁজে দেখ, আছে। বলেছিলেন, প্রলোভনের উর্ধ্বে উঠে দেখ, লৌকিকের আবরণ খসিয়ে দেখ।

তোমরা দেখেছ?

না।

তাহলে কি করে বলছ, আছে।

আছেই তো!

কোথায়?

খুঁজে দেখ।

কোথায় খুঁজবে ওরা, কোথায়? জীবনের জগতের কোন সুদূরতম প্রান্তে? ওরা চতুর্দিকে দৃষ্টির আলো নিয়ে হেঁটে বেড়াল। নেই, নেই। কোথাও নেই। স্পর্শসহ, অনুভবগম্য, দৃষ্টিগ্রাহ্য চতুর্দিকে অজস্র প্রলোভন, অসংখ্য মোহময় আমন্ত্রণ। চতুর্দিকে লোভ পাপ ক্লেদ দুঃখ বঞ্চনা হতাশা মৃত্যু ব্যাধি বিষাদ। ওরা কোথায় যাবে? কেন যাবে? যদি সে-মুক্তি না পায়, যদি ওরাও ব্যর্থ হয়, রক্তক্ষরণে ক্লান্ত, তাহলে কি ফিরতে পারবে?

ওরা ওদের প্রাজ্ঞ পূর্বপুরুষদের আত্মার উচ্চারণের আলোয় অনুভব করতে চাইল, এই অস্বিষ্টের উৎস, মুক্তির ইচ্ছা। ওদের মনে হল, যে জগত স্পর্শসহ, দৃষ্টিগ্রাহ্য; যে জগত লৌকিকসুন্দরে-অসুন্দরে আলোয়-ছায়ায়, সত্য-মিথ্যায়, মানুষের ব্যবহারিক অনুভবের উত্তাপে উজ্বল,

প্রেমে ও অপ্রেমে মৃন্ময় ; আবহমান কালের এই জগত নিয়ে মানুষ সুখী নয়, কিছুতেই নয়। তার যেন অন্য কিছু চাই, অন্য এক চিন্ময় শুদ্ধ জগতের আকাঙ্ক্ষা সে করে, প্রার্থনা করে, যা লৌকিক ধ্যানে ও অলৌকিক অস্তিত্বে রূপাতীত বিস্ময়, সত্যে সুন্দর, পুণ্যে পূর্ণতায় পবিত্র, শুদ্ধ। সম্ভবতঃ সেই-ই মানুষের আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গ, যেখানে পৌঁছনই মানুষের অনির্বাণ আকাঙ্ক্ষা, যা অনির্বচনীয়তায় অবিস্মরণীয়। সম্ভবতঃ সেই সুদূর প্রাগৈতিহাসিক কালের আদিম অন্ধকার থেকে আজকের বিশ্বের দিকে সমস্ত যাত্রাই মানুষের সেই দুর্মর আকাঙ্ক্ষার দুঃসাহসী অভিসার। নতুবা প্রাক্তনের উজ্জ্বল অভিজ্ঞতা, ব্যর্থতা, ক্লান্তি, দুঃসহ রক্তক্ষরণ কেন ক্লান্ত করে না, কেন মানুষ ছোটে, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, আলো-আঁধারীর দিকে কখনো বা অন্ধকারের দিকেই। হয়ত এর তুলনা সমুদ্রমুখী নদী, হয়ত এর উপমা উৎসমুখী ধারা। এবং ওদের মনে হল হয়ত ঈশ্বরের জগতে এই-ই মানুষের নির্দিষ্ট ভূমিকা, হয়ত মানুষের ইতিহাস অতৃপ্তিজাত এমনতর দুঃসাহসিক অভিসারেরই ধারাবাহিক ইতিহাস। ওরা ভাবনা থামিয়ে স্থির হবার চেষ্টা করল, ওদের মনে হল, জীবন আর কিছু নয়, এক অনর্গল প্রবাহ, যা অবাধ, যা ধাবমান এবং—সময়, সময়, সময় সেই আশ্চর্য অনন্ত প্রবাহের আত্মা।

ওরা অবলীলায় বুঝল, আর কেউ নয়, সেই আশ্চর্য সময় ওদের এখানে টেনে নিয়ে এসেছে, এতদূরে। বুঝল তাকে এড়ান যায় না, যাবে না। ওরা চোখ বুজে সেই আশ্চর্য সময়কে অনুভব করার চেষ্টা করল।

অদূরে ঘণ্টা বাজছে। ঘণ্টার বিলম্বিত ধ্বনি ওদের মনে করিয়ে দিল ওরা সেই মিথ্যা মলিন জগত থেকে অনেক দূরের পূত পবিত্র সত্যপীরের দরগার কাছাকাছি, অলৌকিক শুভ্রতায় স্নিগ্ধ সিক্ত সুবাসিত স্বস্তির সেই আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গের অতি সন্নিকটে, যেখানে, বিশ্রী পূতিগন্ধময় কোলাহল নেই, অনর্থের কলরব নয়, ক্লেদ পাপ ক্লৈব্য দুঃখ দৈন্য—কিছু না। এই জগত অন্ধকারহীন এক শুদ্ধ আলোয়

আলোময়, উদ্ভাসিত, উৎসারিত, আনন্দময়।

ওরা চোখ মেলল। চোখ মেলতেই দেখল, সিংহদ্বারের শীর্ষে একটি বিশালকায় আলোর গোলক, তাকে ঘিরে দুটো পাখী, সাদা ও কালো, দ্রুত আবর্তন করে ফিরছে ; আর ছটা ছ-রঙা পাখী, ধীরে অতি ধীরে। ওরা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকাল। ওদের মনে পড়ল, দিন রাত্রি ও ঋতুসমূহের কথা। ওর পা বাড়াল। সম্মুখে ঊর্ধ্বমুখী সিঁড়ি।

ওরা ক্রমান্বয় ধাপ ভাঙছে।।

## ১২

## রাত্রি তমসাময়ী

সংখ্যাহীন ধাপের অন্তিমে, ক্লান্ত অবসন্ন স্বেদাক্ত ওরা, চূড়ার সমতলে পেঁছিলে প্রথমে দেখল এক গলিতচক্ষু, লোলচর্ম, বিকলাঙ্গ বৃদ্ধ, যিনি অবলীলায় বাতি জ্বালিয়ে চলেছেন। বলাবাহুল্য, ওরা খুবই বিস্ময় মানল, যেহেতু চক্ষুহীনের পক্ষে এমন ক্রমান্বয় এবং নিখুঁত আলো জ্বালান সত্যই অভাবিত। ওরা বিমূঢ় হল, ভাবল, হয়ত লোকালয়ের কোলাহল ও কলঙ্কমুক্ত শুদ্ধ স্বর্গে সবই সম্ভব। তাই পলকে ক্লান্তি ভুলে অবসন্নতাকে সরিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল সেই অতিবৃদ্ধ পিতামহের দিকে, এবং অপরিমিত কৌতূহলে শুধল, এত আলো কেন ?

কেন ? বৃদ্ধ স্মিতহাস্যে মুখ তুললেন। বললেন, অন্ধকারকে ঠেকাবার জন্যে।

অন্ধকারকে ?

তীক্ষ্মমুখ এই নিতল প্রশ্নের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে একান্ত শহুরে ওদের কাছে বৃদ্ধের উক্তি সম্পূর্ণ হেঁয়ালী বলে মনে হল। জটিলতার সহস্র পাকে বদ্ধদেহ ওদের মনে হল, এ হাসি অর্থহীন, কথাগুলো নিরর্থ, যেহেতু এই প্রদীপ সমূহের আলো চতুর্দিকের নিরন্ধ্র আকারগ্রাসী সর্বগ্রাসী অন্ধকারের তুলনায় অত্যল্প, এ আলো আদৌ দীর্ঘদেহী নয়, এর পক্ষপ্রসার অতিমাত্রায় নগণ্য, এমন কি বিস্তীর্ণ দরগার অন্ধকারের পক্ষেও এ আলো এত সামান্য যে অনুল্লেখ্য। ওরা ভাবল, বৃদ্ধ

চলৎশক্তিরহিত এবং কর্মহীন বলেই কর্মের বিকল্প হিসেবে হয়ত এই খরচে খেয়ালের দাসত্ব করে চলেছেন। সম্ভবত দরগার কর্মকর্তারা বয়োবৃদ্ধ পিতামহের প্রতি অগাধ অবাধ সম্মান ও শ্রদ্ধা হেতু তাঁর অমল ইচ্ছায় বাধা দিচ্ছেন না। ওরা মনে মনে দরগার কর্তৃপক্ষ ও পীরসাহেবের প্রতি অতিমাত্রায় শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠল, ভাবল আরো আরো কত সংখ্যাহীন অমল ইচ্ছাপূরণের বিমল রূপ ওরা এইখানে, এই পবিত্র ভূমিতে প্রত্যক্ষ করবে। এই ভাবনা ওদের স্বস্তি দিল, অনন্ত সান্তনা। ওরা পথের দুঃখ ভুলে ধন্যবাদ দিল ওদের এই অভিসার ইচ্ছার দেবতাকে, ওদের ঈশ্বরকে, এবং মুহূর্তে বৃদ্ধের দিকে চোখ ফেরাল, দেখল স্মিত হাসি মুখে বৃদ্ধ অনায়াসে ক্রমান্বয় বাতি জ্বালিয়ে চলেছেন, তেমনি স্বচ্ছন্দ, নিখুঁত। ওরা মুগ্ধ বিস্ময়ে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল।

বৃদ্ধ হেসে বললেন, দাঁড়িয়ে কেন, এগোও।

কোথায় ?

বৃদ্ধ হাসলেন। বললেন শান্ত মিষ্টি গলায়, সে তুমিই জান।

তিনি আলোয় মুখ গুঁজলেন।

ওরা চোখ ফেরাল। তাকাল সম্মুখে। আলো ডিঙোতেই ওদের চোখে পড়ল অন্ধকার। অন্ধকারের দিকেই পা বাড়াল।

সামনেই খাদ ! পশ্চাতে বৃদ্ধের প্রশান্ত কণ্ঠস্বর।

খাদ ?

এই দুই বর্ণ যুক্ত শব্দ হঠাৎ বহুবর্ণের সম্মিলিত অন্ধকার হয়ে দিগন্ত বিদীর্ণ করা বিশ্বগ্রাসী আর্তনাদে ওদের সম্মুখে ফেটে ফুটে চৌচির হয়ে গেল : ওরা চমকে শুধল, সে কী ! কোথায় ? ওদের বাড়ান পা স্থির হল। দেখল সত্যিই খাদ সম্মুখে ( মনেও ) ! ওরা অপলক তাকিয়ে রইল সেই বিকট খাদের দিকে। কালো জল থিকথিক করছে খাদের গহন গহ্বরে। ওরা ঝুঁকে পড়ল। কী দুর্গন্ধ ! কী দুর্গন্ধ ! নাকে কাপড় চাপা দিয়ে সোজা হল। মুহূর্তে ( কি উপায়ে ঈশ্বর

জানেন, ওরা ভাবল ) সে জল কিছু পরিমাণে অপসৃত হলে, একটি অত্যাশ্চর্য শুভ্র পাথরের অনর্গল বিচ্ছুরিত আলোয় ক্ষণপূর্বের কালো দুর্গন্ধযুক্ত জল দুগ্ধ ফেননিভ শুভ্রতায় অপরূপ হয়ে উঠল, সৌরভে শুদ্ধ। ওরা যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হল, বিব্রত, হতবাক। যদিও ওরা ভাবতে পারত, এ সমস্তই অলৌকিক সংগঠনের অন্তর্গত বিস্ময়, ভাবতে পারত, প্রতীকের আশ্রয়ে কোনো সহজতম সত্যের প্রকাশ, কিন্তু না, যেহেতু ওদের ভাবনার মুখ তখন বিপরীতে, তাই ভাবল, এ সমস্তই কোনো যাদু-কাহিনীর অন্তর্গত, কোনো লৌকিক যাদুকরের অলৌকিকের বিস্ময় জাগানোর ছদ্মকৌশল, এ ফাঁদ। ওদের ক্রমে, ক্রমান্বয়ে মনে হল, ওই পিতামহ সদৃশ বৃদ্ধের আলো জ্বালান খেয়াল নয়, অমল ইচ্ছাপূরণ নয়, ছলনা। মনে হল, ওই-ই ছদ্মবেশী যাদুকর যে আলোর সম্মোহনে বশীভূত করে, অলৌকিকের অনুভব জাগিয়ে কার্যোদ্ধারের চতুর জাল পাতছে। একথা মনে হতেই ওরা মুখ ঘুরিয়ে বৃদ্ধের দিকে তাকাল। আলোমুখী বৃদ্ধের মুখাবয়ব ওদের নজরে এল না, দেখল পশ্চাতের অস্থির অন্ধকার, এবং সেই অন্ধকার থেকে চোখ সরাতেই, সেই একই অন্ধকার বিশাল ছায়া হয়ে আকাশের গায়ে কাঁপছে, ওরা দেখতে পেল।

যে ঘৃণা অন্ধকারের অন্তর্গত, যে ঘৃণা প্রেমকে দূরে সরিয়ে রাখে, বিকর্ষণকে তীব্র তীক্ষ্ণ করে, ওরা সেই তীব্র তীক্ষ্ণ ঘৃণায় ফেটে পড়তে চাইল, বলতে চাইল, মিথ্যা, মিথ্যা।

কিন্তু তার আগেই কে যেন পাশ থেকে বলল, বাঁয়ে এগোলেই ঘর, বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে। ওরা শব্দের দিকেই তাকাল, অন্ধকারে একটা ছায়া ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে, দূরে।

সেই ছায়ার জন্য ওদের কৌতূহল আর অবশিষ্ট ছিল না, বরং স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ওরা ভাবল, আপাততঃ বিশ্রামই শ্রেয়। ওরা বাঁয়ে পা বাড়াল।

কিয়দ্দূরেই সেই ঘর, ঘরের গহ্বরে একটি মেঠো প্রদীপ জ্বলছে। ওরা ঘরে ঢুকল এবং ঢুকতেই, আশ্চর্য, দরজার কপাট বন্ধ হয়ে গেল পলকে! চকিতে পিছন ফিরতেই স্পষ্ট শুনল, বাইরে কে যেন শেকল টেনে দিচ্ছে। এবং আরো আশ্চর্য, বাতিটা হঠাৎ নিবে গেল।

প্রাথমিক সন্দেহ, সংশয়, ভয়, অবিশ্বাস আরো নিবিড়, আরো ঘনিষ্ঠ হলে ভাবল, ওরা নিশ্চিত গন্তব্যের সম্পূর্ণ উল্টোপথে, গরঠিকানার এক বিকট ফাঁদে এসে আটকা পড়েছে। এবং ওদের মনে হল, সম্ভবত এই সেই খুনেদের আস্তানা, যেখানে দু-দুটো খুন হয়েছে এবং ওরাও খুনেদের কবলিত। ওদের আর মুক্তি নেই।

ওরা সভয়ে চতুর্দিকে তাকাল।

অন্ধকার দেয়াল হয়ে ওদের গ্রাস করছে মনে হতেই, ওরাও তমোময়ী রাত্রির মতো অন্ধকারের দেয়াল হয়ে গেল॥

১৩

## কে এই রমণী

এবং অবলীলায় ওরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, অতি সাধারণ মানুষী কূটকৌশল ও ছলনার হাতে ওরা সম্পূর্ণ পরাভূত। এই পরাজয় ও পরাজয়জনিত প্রতিক্রিয়া ওদের অনায়াসে অবশ করে ফেলল, ওদের মনে হল, দেহে মনে উদ্যম আর অবশিষ্ট নেই, ওরা আর পারে না।

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত আসামী যেমন বাঁচার জন্য সর্বচেষ্টার অন্তিমে ব্যর্থ হয়ে ভেঙে পড়ে, নিরুপায়ের মতো ভাগ্যের হাতে নিজেকে নিঃশর্ত সমর্পণ করে একান্তে নিজের হৃদস্পন্দন শোনে, এবং এই স্পন্দন থামার ঘন্টাধ্বনির নির্মোহ প্রতীক্ষা করে, অনন্যোপায় ওরাও অনুরূপ ক্লান্তিতে তেমনই প্রতীক্ষার অন্তিমের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল, ভাবল এই-ই নির্মম নিয়তি, দুঃসহনীয় ভাগ্য।

অথচ ওরা কি এই জন্যে, অন্তহীন দুর্ভাগ্যের এই অসহ দায়ভার বইবার জন্যে, এত বন্ধুর চড়াইয়ের পথ, এত উৎরাই পেরিয়ে এতদূরে ছুটে এসেছ ?

হয়ত।

ওদের মনে পড়ল, সংসারের সীমায় অস্থির বহুপল্লবা পুষ্পিত সেই সব ঊর্ধ্বমুখ বৃক্ষ, ইতঃস্তত প্রগলভ রোদ্দুর, মনস্পর্শী সৌরভের কথা। মনে পড়ল, অসংখ্য নক্ষত্রের আকাশ, অবাধ শান্তির মতো সম্ভ্রান্ত সবুজ মাঠ, বিস্তীর্ণ চক্রবাল। মনে পড়ল, সহস্র বর্ণের পাখী,

তাদের সাবলীল কণ্ঠ, স্বতঃস্ফূর্ত হাওয়া, আলো, মেঘ ; মনে পড়ল, ভাঙা বিকেলের অতিম্লান রোদে রাখাল ছেলের তাড়া খাওয়া গাইগুলোর ক্ষুরে ক্ষুরে ওড়া ধূসর ধুলোর কথা, আশ্চর্যের পিদিম জ্বালান সন্ধ্যা ও রাত্রির কথা, এবং দূরতম স্মৃতির নিরন্ধ্র অন্ধকার থেকে মুখ বাড়ান একটি নবজাতকের আকস্মিক কান্নার কথা।

সব তো ছিল ওই সীমায়। সুখ ছিল, হাসি আনন্দ ছিল, ভালবাসা, মমতা প্রেম ছিল ; সবচেয়ে বড় কথা, অসংখ্যের মাঝখানে ছিল ; তবু, তবু ওরা এতদূরে ছুটে এল কেন ? কি সেই দুঃখ ? সেই যন্ত্রণা ? এই অনন্তর দুর্ভাগ্যের তুলনায় সে দুঃখ, সে যন্ত্রণা কি স্বল্প নয় ?

না।

তাহলে দুর্ভাগ্যের দায়মুক্তি অসম্ভব।

তবে কি মৃত্যুই অন্তিমে ?

সেই শেষ কথা, শেষ উচ্চারণ কে করবে ? হৃদয়ে যতবারই হাত রাখ, বার বার সেই একই কথাই বলবে সে, জানি না।

হয়ত এই নেতিই সমস্ত অন্বিষ্টের সীমা। হয়ত এ নয়, কিছুতে নয়।

কিন্তু সে কী ?

সূচীভেদ্য অন্ধকার ঘিরে প্রসন্ন নির্জনতা তখন স্বপ্নের মতো চুপিসাড়ে হাঁটছিল চতুর্দিকে, মনে হচ্ছিল না কোথাও কোনো মানুষ আছে, কোনো প্রাণী, পাখী বা পতঙ্গ, এমন কি বৃক্ষ লতা গুল্মের অস্তিত্বও উহ্য বলে মনে হচ্ছিল। ওদের ধারণা হচ্ছিল, সমগ্র বিশ্ব বুঝিবা গভীর জলের নীচের জলজ ঘাসের মতো স্থির, অকম্প। মনে হচ্ছিল, ঘুমুচ্ছে, গভীর প্রগাঢ় ঘুমে। এবং কে যেন কানে কানে ওদের বলছিল, ওকে ঘুমুতে দাও, সে ঘুমাক।

ঘুমাক সে, নৈঃশব্দ্যের গভীরে, অন্ধকারে। বরং ওরা ততক্ষণ ভাবুক অন্ধকারের অন্তর্গত, নৈঃশব্দ্যের অন্তরঙ্গ অনর্গল রহস্য, অনন্ত বিস্ময়ের কথা।

কত রাত ?

কে জানে।

দূরে ও কাছে নৈঃশব্দ্য তখনো খেলছে, খেলা করছে অফুরন্ত অন্ধকার, অন্ধকার। বিনিদ্র ওদের চোখ বুজে বুজে আসছিল ক্লান্তিতে, কান্নায়। ভাবছিল মৃত্যু, কামনা করছিল মৃত্যু, প্রার্থনা করছিল মৃত্যুর। হঠাৎ ওরা অপরিমিত বিস্ময়ে পুলকে দেখল অন্ধকারকে সরিয়ে কি যেন কি এগিয়ে আসছে দ্রুত। ও কি জোনাকী, না কি বিদ্যুৎ, না কি আলো ? ওরা ত্বরিতে উঠে দাঁড়াল, দেখল উজ্জল আলো হাতে এক অপূর্ব রমণী, তার অবনত মুখে, শিখা, প্রদীপ শিখা আলো হয়ে স্বচ্ছন্দে খেলছে।

আলো ক্রমে ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ। ওরা নিষ্পলক আলোর দিকে, আলোয় উদ্ভাসিত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কে এই রমণী? শুধল সে।

জানি না।

নৈঃশব্দ্য কেঁপে উঠল, অন্ধকার ভাঙছে। এবং সেই অনিন্দ্য রমণী মুখ চোখ তুলল। তাকাল। এক অঙ্গে এত রূপ, এতো ?

সে বলল, আমি যাব।

কোথায় ?

ঐ রমণীর কাছে।

আমি বিস্মিত হলাম না, ভয় পেলাম না, বাধা দিলাম না। অনায়াস সহজতায় বললাম, যাও।

সে চলে গেল।

সর্বনাশের লগ্নে অর্ধেক ত্যাগের কথা আমি জানতাম, এবং এও জানতাম অন্তিমক্ষণ যখন আসন্ন, তখন নৈতিক বাধার বিড়ম্বনা নিরর্থ। বরং যাক সে, খুঁজে দেখুক কি আছে অন্তিমে-মৃত্যু, না মুক্তি।

যদি মুক্তি থাকে ?

এমনি নিশ্ছিদ্র অন্ধকারকে আজন্মের ভয় আমার, অসহ্য। প্রার্থনা ছিল আলোর, ভালবেসেছি আলো, নিরন্তর আকাঙ্ক্ষা করেছি আলো। অথচ জন্মাবধি অন্ধকার, দুঃসহ অন্ধকার ঘিরে রইল আমাকে। যতবার পা বাড়াতে চেয়েছি, অন্ধকার দেয়াল হয়ে পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে, ছুটে পালিয়েছি তফাতে, অন্ধকার ছায়া হয়ে অনুসরণ করেছে আগে পিছে, কিছুতেই এড়ান যায় নি, এড়াতে পারি নি।

হয়ত অন্ধকারের এ অধিকার ছিল, আছে। হয়ত অন্ধকারকে এড়াবার মন্ত্র আমার অনায়ত্ত। নইলে সে কেন বারম্বার ছায়া হয়ে ফিরবে, আগলে রাখবে আমাকে, পায়ে পায়ে বাধা হয়ে বাজবে।

আমি ক্রমান্বয় অন্ধকার ভাবতে ভাবতে অন্ধকারে ডুবে গেলাম। সে তখনো ফেরে নি ।।

## ১৪
## কার পদধ্বনি

হৃদয়ে দুন্দুভির মতো ভয় বাজছে, মনে মৃদঙ্গের বোল তুলে মুক্তি নাচছে। কে যেন মৃদু পায়ে এসে কর হানছে দ্বারে। বলছে, ওঠো; বলছে, ওঠো না। উৎকণ্ঠা আমার আকাশ হয়ে যাচ্ছে, উদ্বেগ শঙ্খের শব্দ তুলে আমার অস্তিত্বকে ঘিরে ঘুরছে। আমি জানি না, কে আমার অপেক্ষায়,—মৃত্যু, না মুক্তি?

যদি মৃত্যু হয়, আমি সানন্দে তাঁর হাতে নিজেকে সঁপে দেব, বলব, অসহ্য এ দাহ; বরং তুমিই গ্রহণ কর আমাকে, সর্বদহনের ইতি হোক, ইতি।

আর যদি মুক্তি হয়, আমি ভাবলাম, আমি এই অনির্বাণ জীবন নিয়ে আকাশ প্রদক্ষিণ করব, বাতাস হব, রৌদ্র হব, আমি ভালবাসার মেঘ হব, বৃষ্টি; আমি আশ্চর্যের প্রদীপ হয়ে জ্বলব।

কে যেন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। পদধ্বনি, কার পদধ্বনি? আমি উৎকর্ণ হলাম। শেকল খুলছে।

কে? কে?

আমি।

তুমি?

হ্যাঁ, আমি।

অন্ধকারেও দেখলাম সম্মুখে দাঁড়িয়ে সে, যেন উজ্জ্বল হীরক খণ্ড, খুশীতে জ্বলছে। বললে, চল।

কোথায়?

আমার পিছু পিছু।

সেই-ই ভালো।

আমি পেছনে পেছনে চলতে লাগলাম।।

## ১৫

## গুহাশ্রিত অন্ধকারে

কোথায় চলেছি জানি না। সে বলেছে, আমাকে অনুসরণ কর, আমি ছায়ার মতো তাকেই অনুসরণ করে চলেছি। যতোদূরে সে নিয়ে যাবে, যতো দুর্গমে, আমাকে যেতে হবে। কেন যাব, কোথায় যাব, সে প্রশ্ন আমি করি নি, করতে পারি নি ; শুধু মনে হয়েছে সর্বনাশের এই চরম লগ্নে, এ আশ্বাস স্বল্প নয়। যদি অন্তিমে মৃত্যু থাকে, তাকে না মেনে গত্যন্তর নেই, হয়ত সেই-ই নিয়তি ; যদি মুক্তি থাকে, সান্ত্বনা থাকবে জীবন আমাকে ঠকায় নি, জীবন আমাকে অনেক দিল। কিসের বিনিময়ে সে প্রশ্ন নিরর্থক, যেহেতু আমি জানি, বিনামূল্যে কিছুই মেলে না।

এই তো সেই জীবন যার পায়ে পায়ে মৃত্যু, যন্ত্রণা, জটিলতা। অস্তিত্বের সমূহ বিনাশ সে তো সমস্তের অবসান। তাতে দুঃখের পরিমাণ আর কতটুকু ? বরং এই যে প্রবহমান জীবন এর অতিবন্ধুর পথ, দুর্গম চড়াই-উৎরাই, এর অসহ দুঃখ-কষ্ট-দাহ সব, সমস্ত কিছুই দৈহিক মৃত্যুর চেয়ে সহস্র গুণ ভয়াবহ, কঠিন, কঠোর, রুক্ষ। বাঁচার বেদনার তুলনায় মৃত্যুর দুঃখ অনেক সহজ। তবু বাঁচতে চাই ঐ আলো-হাওয়ায়, ঐ রৌদ্রে-ধারায়, ঐ পুষ্পের সুবাসে ; বাঁচার অমলিন মুক্তি চাই—যেহেতু ইতি সর্বনাশা, চরম নির্বাণ, সমস্ত দহনের অবসান, সমস্ত জ্বালার পরিসমাপ্তি। আমি তো তা চাই নি।

তবে এতদূরে ছুটে এলাম কেন ? সে কী মৃত্যুর জন্যে, নাকি মুক্তির। মনে আছে, মুক্তিই প্রার্থনা ছিল আমার, আনন্দিত, অফুরন্ত মুক্তি। এবং মনে আছে, সেই দুর্লভ, সেই বিরল মুক্তির আশায় কে যেন ছুটিয়ে নিয়ে এল আমাকে, বলল, এগিয়ে যাও, খুঁজে দেখ।

কি দেখব, কাকে দেখব, কোথায় দেখব ? সে কে, সে কী, সে কোথায় ?

কোনো উত্তর হাতে ছিল না আমার, ছিল তীক্ষ্নমুখ সহস্র প্রশ্ন, দাহ। ওরা অসহায় আমাকে নির্মম ভাবে বিঁধল, আমি সেই তীব্র আঘাতে রক্তাক্ত হলাম, ক্রুদ্ধ হলাম, ছুটে এলাম। যদি শুধোও, কি অমল ঐশ্বর্য তোমার ছিল যে এই দূর-দুর্গমে পাড়ি জমালে? সবিনয় জবাবে বলছি, রাশি রাশি ভয়, গুচ্ছের সংশয়, অনন্ত দ্বিধা, অসীম অবিশ্বাস। এ-ছাড়া আর কিছুই ছিল না, কি করে থাকবে? গর্ভের অন্ধকারে থাকতে ভেবেছিলাম, উজ্জ্বল আলোর দিকে আমার যাত্রা, আমার ক্রমান্বয় অভিসার। আমি এলাম। কোথায় আলো? দেখলাম চতুর্দিকে পুঞ্জীভূত অন্ধকার। সে অন্ধকার বহুকালের। এখনো সেই অভেদ্য অভঙ্গ অন্ধকারেই আমি হাঁটছি, আগে আগে সে আরো অন্ধকার হয়ে পথ জুড়ে চলেছে। এখন সে যেখানে নিয়ে যাবে আমাকেও সেখানেই যেতে হবে। এমন অসহায়, এমন নিশর্ত আত্মসমর্পনের ইতিহাস এ জীবনে এই-ই প্রথম। রুখে উঠব, সে শক্তি অবসিত; সয়ে যাব, সে উদ্যম অবশিষ্ট নেই। কোথায় যেন বাঁধা আছি, ছিলাম। সে কোথায়?

কতদূরে নিয়ে যাবে? আমি শুধোলাম।
সে বললে, এসে গেছি।

অন্ধকার ডিঙোতে ডিঙোতে ক্লান্ত আমরা কিছুতেই অন্ধকারের সীমান্তের নাগাল পাচ্ছি না। ভাবছি, এ কোন অন্ধকার, যে অফুরন্ত। এই কী সেই অনন্ত অন্ধকার, সেই নরক আলোহীন, হাওয়াহীন—এই কী সেই কুৎসিত তমসা, যে আলোকিত হয় না, যাকে আলোকিত করা যায় না, যে নির্বাক।
আমার মনে পড়ল সেই আশ্চর্য পদগুলি। উচ্চারণ করলাম :

'অতি পরিচিত এক তৃপ্তির শিয়রে উচ্চারিত হবার আগে
এ কোন বন্ধুর অন্ধকারে আমাকে টানছ,

ক্রমে, ক্রমান্বয়ে আমি ছুটেছি।

কি যেন ছাড়িয়ে এলাম, কি যেন পড়ে রইল পিছে
হাওয়ার হাততালি আমাকে বাঁধল না,
রৌদ্রের নুড়ি ধুলো হয়ে গেল পায়ের চাপে
ছায়াবৃক্ষের শীতল সান্ত্বনা আমাকে শান্তি দিল না।

কতদূর নিয়ে যাবে—

সঙ্গীহীন, সঙ্গহীন কোন সুদূর গভীরে আমি যাব,
কত দূরে?

পল্লবে মুখর হবার আকাঙ্ক্ষা আমার অবসিত,
বিশ্বস্ত কুঁড়িতে আমি বিষাদ।
চেয়েছিলাম প্রস্ফুটিত পুষ্পের শরীর, সৌরভ,
আমাকে দিলে না।

তাহলে নিয়ে চল—
উৎসবহীন অন্ধকারের সেই অনায়াস কঠিনতায়
আমি যাব।'

মনে মনে বললাম, সেই-ই ভালো।

কতদূর গিয়েছিলাম জানি না, সে আমাকে দাঁড়াতে বলে হঠাৎ অন্ধকারের দিকে ছুটে গেল।
ফিরে যখন এল সঙ্গে সেই আশ্চর্য রমণী, যার সর্বঅঙ্গে রূপ উজ্জ্বল আলো হয়ে জ্বলছিল। আমি সেই অনির্বচনীয় রূপ থেকে বিচ্ছুরিত আলোর মধ্যে অন্ধকার মুক্তির উপায় খুঁজছিলাম, তন্ময় হয়েছিলাম।

হঠাৎ সে, যে আমার অস্তিত্বের ঘনিষ্ঠ, অতি সক্রিয় অংশ, হেসে উঠল। দেখলাম হাসি বিদ্রূপ হয়ে জ্বলছে তার চোখে এবং পলকে সে আমাকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলল। লজ্জায় ঘৃণায় আমার মস্তক অবনত হল, আমি অনুতপ্ত হলাম, বললাম, ক্ষমা কর।

সে বললে, এগিয়ে যাও।

কোথায় ?

সামনে।

তোমরা যাবে না ? আমি শুধলাম।

পেছনে যাচ্ছি।

সে কী। আমি যে কিছুই চিনি না, জানি না। বরং বলে দাও, কোথায়, কোনদিকে আমি যাব।

সে কি যেন ভাবল। বলল, বেশ, তবে পাশাপাশি যাওয়া যাক।

সেই-ই ভালো। আমি স্বস্তিতে শ্বাস নিলাম।

সে ওপাশে, আমি এপাশে, মাঝে সেই রমণী। রমণী বললে, আরেকটু এগোলেই সেই গুহা।

আমরা গুহার মুখে এসে দাঁড়ালাম। ফিরে তাকালাম পেছনে। দেখলাম রাশি রাশি অন্ধকার জমে জমে পাথর হয়ে যাচ্ছে।

আমরা গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম।

সে আমাকে বলল, গুহার ভেতরে একটা সুড়ঙ্গ পথ আছে, সে পথ দিয়েই আমরা জনপদে পেঁছিব।

কে সেই পথ দেখিয়ে দেবে ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সে বললে, ও।

আমি সেই রূপসী রমণীর দিকে তাকালাম। আশ্চর্য। অপরূপ রূপের আলো আর আমার চোখে পড়ল না, সে কখন অন্ধকার হয়ে গেছে। শুধু অনুভবে বুঝলাম, সে আছে, পাশেই।

রমণী বলল, সামনেই সেই পথ।

কে আগে যাবে ? ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছে, আমি ঘামছি।

সেই রমণী জবাব দেবার আগেই সে বলল, তুমি।

আমি ! কেন ?

তুমিই আমাকে এতদূর নিয়ে এসেছ।

সত্যিই তো। আমি নিয়ে এসেছি এতদূরে। তাহলে আমাকেই আগে যেতে হবে, আমিই যাব।

আমি অন্ধকারে হাত বাড়ালাম, অন্ধকার সরে গেল। আমি যাচ্ছি।

না, আমি পেছনে ফিরে তাকাব না। ওরা আসুক, না-আসুক, আমাকে এগোতেই হবে।

পেছনের পদশব্দ ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসছে, শুধু শুনছি, ওরা কি যেন বলাবলি করছে। করুক।

রমণী খিল খিল করে হেসে উঠল। আমি থমকে দাঁড়ালাম। কেন হাসছে ? হয়ত সে···

না, আমি ভাবতে চাই না, ভাবব না। ক্রমে আমি ছুটছি। অন্ধকার সরে যাচ্ছে, যাচ্ছেই।

আমি গুহাপথের অন্তিমে, পা বাড়ালেই জনপদ, আমি তাকালাম। দূরে বুঝি আলো জ্বলছে, আলো ! সেখানে কি জনপদ আছে ?

হঠাৎ পশ্চাতের বিকট বিকৃত আর্তনাদে আমি স্থির হয়ে গেলাম। স্পষ্ট শুনলাম, সে বলছে, বাঁচাও। ভেতরে যাব কি যাব-না ভাবছি, আর্তনাদ অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। হয়ত সে নেই ; এবং একজোড়া পায়ের শব্দ দ্রুত নিকটতর হচ্ছে। তবে কি সেই রূপসী রাক্ষুসী আমাকেও গিলতে আসছে ? আমি ত্বরিতে গুহামুখের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। পাশেই গুহামুখের পাথর, প্রাণপণে ঠেলে দিলাম। গুহামুখ রুদ্ধ।

এবং আমি সেই পাথরের পাশেই ঢলে পড়লাম।

অন্ধকার ।।

## ১৬
## আলো হাতে কে তুমি

কিছুই জানি না। পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র পলকে অন্ধকারে ঢেকে গেল।

যখন চোখ মেললাম, দেখলাম, একই অন্ধকারে আকাশ আচ্ছন্ন, বাতাস স্তব্দ, চতুর্দিকে গুমোট নৈঃশব্দ্য। আমার মনে হল, আমার অস্তিত্ব ভারশূন্য, আমি অনন্ত শূন্যতার মাঝে ডুবে আছি, ঝুলে আছি।

এ কোথায়?

আমি ভয়ে দিগন্ত বিদীর্ণ করা আর্তনাদে ফেটে পড়ে বললাম, বাঁচাও। আমার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে আমার কাছেই ফিরে এল। আমি ভয়ে চোখ বুজলাম।

কে?

অকস্মাৎ আলোয় আলোকিত হয়ে গেল চতুর্দিক। এ কোন প্রগাঢ় বিস্ময় অপেক্ষায় ছিল আমার, এ কোন শুভ্র আলো আমাকে স্বাগত জানাল!

কে? কে তুমি? আমি চোখ মেলে তাকালাম।

আশ্চর্য! সেই গলিতচক্ষু, সেই লোলচর্ম বৃদ্ধ, প্রদীপ হাতে হাসছেন!

তুমি?

হ্যাঁ, আমি।

কি যেন কি হয়ে গেল পলকে। না না, এ অসম্ভব, এ নয়, এ হয় না। আমি বিস্ময়ে পুলকে দেখলাম, সেই লোলচর্ম, গলিতচক্ষু বৃদ্ধ কোথাও নেই, আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমিই হাসছি।

আমি ?

হ্যাঁ, তুমি।

তিনি আমার দিকে প্রদীপটা এগিয়ে ধরে শুধলেন, ফিরে যাবে ?

আমার সর্বদেহ মনে উচ্চারিত হল, হ্যাঁ। আমি সানন্দে মাথা নাড়লাম। বললাম, যাব।

তাই-ই যাও। তিনি আলোটা আমার হাতে দিলেন। বললেন, বাঁচিয়ে রেখো।

অফুরন্ত আনন্দের উদ্ভাসে তাঁর অনিন্দ্য মুখ উদ্ভাসিত হল ।।

।। নিষাদ সমাপ্ত ।।